গল্প

সেলিনা হোসেন*

ধারণা

ছাব্বিশ বছরের তনুশ্রী পঁচাশি বছরের ফখরুল আহমদ চৌধুরীর প্রেমে পড়েছে।

তনুশ্রীর যুক্তি একটাই, না আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের কাছে এর কোন জবাবদিহির উত্তর এটা নয়। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার সময় এই যুক্তি দাঁড় করানো একসময় দরকার ছিল ওর। এখন আর যুক্তি টুক্তি লাগে না। নিজেকে সামলে ফেলেছে। এখন সত্যিটা ভারী সুন্দর।

ওর যুক্তি ভদ্রলোককে দেখতেই বুড়ো দেখায়। কিন্তু তার আচরণে,ভাষার প্রকাশে এবং যৌন আকাংক্ষায় তার মধ্যে তারুণ্যের দীপ্তি জ্বলজ্বল করে। তার সঙ্গে কমিউনিকেশনে অসুবিধা নেই। চমৎকার ভঙ্গিতে পুরো আবহ এমন মোহনীয় করে ফেলে যে মুগ্ধতার রেশ কাটে না।

আর বয়স? বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত তো একজন যুবকও হতে পারে, যার ভেতরে সৃষ্টিশীল উচ্ছাস একদমই অনুপস্থিত! বয়সে কিছু এসে যায় না।

অতএব তনুশ্রী আপন ভাবনায় মশগুল। ফখরুল আহমদ চৌধুরী ওকে নিবিড় কণ্ঠে বলে, সম্পর্ককে কখনো বিয়ে নামক ইন্সটিটিউশনে ঠেসে ফেলা উচিত নয়। সম্পর্ক হবে সীমাহীন, রঙিন এবং রঙের রেশমি সুতোয় সম্পর্কের প্রতিটি গিটঠু হবে অমলিন। এই গিটঠু খোলার সাধ্য কারো নেই। বুঝলে হিরের টুকরো। তোমার হাতটা দাও আমি ধরে রাখি। তোমার হাতটা বড় পবিত্র, মায়াবী এবং স্নিগ্ধ। তোমার হাত ধরলে আমার সমস্তশরীর অবশ হয়ে যায়। মনে হয়, কেউ যেন আমার মাথার কাছে বসে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। আমি ঘুমুচ্ছি, ঘুমুচ্ছি-ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছি। আমার জীবনে ঘুমের খুব অভাব রে মেয়ে।

এসব কথায় অভিভূত হয়ে যায় তনুশ্রী। অপলক তাকিয়ে থাকে মানুষটির দিকে। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনায় ধানমণ্ডির লেকে। পাখিদের ডানায় ঘরে ফেরার তাড়া। তনুশ্রীর শরীরে শিহরণ–এমন মানুষইতো চাই, যার যৌবন উদ্দীপিত করে দেয় শরীর ও মনের সবটুকু। বয়সের হিসেবে গরমিল হলে হোক, কিছু এসে যায় না। তনুশ্রী জানে অন্ধকার নামলেও ও মানুষটির সবটুকু দেখতে পায়। এত গভীর

---

* কথা সাহিত্যিক ও প্রাক্তন পরিচালক, বাংলা একাডেমী।

দৃষ্টিতে দেখে রেখেছে যে দেখায় ভুল হয় না। তার গালভাঙা মুখে ক্লান্তির ছাপ, বয়স তাকে ছুঁয়েছে এটুকুই। আর কোথাও নয়। তার প্রশস্তকপাল, ফাঁকা হয়ে গেছে মাথার অনেকখানি, ফ্যাকাশে লালচে চুল পুরোটা সাদা নয়। জোড়া ভুরু, ফর্সা গায়ের রঙ এবং টানা ঋজু ফিগার–শুকনো কিন্তু ভাঙা নয়। আশ্চর্য ভরাট কণ্ঠে দারুণ আবৃত্তি করে রবীন্দ্রনাথ।

একদিন কলেজের শিক্ষক ছিল। বলে, তনুশ্রী, পড়ানো ছাড়া আমি আর কিছু পারতাম না। সাহিত্য পড়াতো মানুষটি। ইংরেজী সাহিত্য। টি.এস.এলিয়ট তার প্রিয় কবি। অন্য ক্লাশের ছেলেমেয়েরাও এসে তার ক্লাশে ভরে যেত। মুগ্ধ হয়ে শুনতো তার লেকচার।

তনুশ্রী বিস্ময়সূচক ধ্বনি তুলে বলতো, তখন কেন আমার জন্ম হয়নি। কেন আমি সে সময়টুকু পেলাম না!

হাসিতে পৌরুষের রেশ ছড়িয়ে লোকটি বলে, আমার এখনকার সময়ের সবটুকু তোমাকে দেবো বলেই তখন তোমার জন্ম হয়নি।

তনুশ্রী এমন উত্তরে ধাক্কা খায় না। ভাবে না যে, তাহলে কি মানুষটি তার জীবনের এক এক সময়ে এক এক জনকে পেয়েছে? যারা বিশেষ বিশেষ সময়ের ব্যবধানে তার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে?

মুগ্ধ তনুশ্রীর বুকের ভেতরে প্রশ্ন নেই। তার একটি কারণ আছে। লোকটির অনেক গল্প আছে। সে গল্পগুলো তনুশ্রীর সবই জানা। তার তিন ছেলেমেয়ে অসাধারণ মেধাবী। বিদেশের নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়। খুব কমই দেশে আসে। বেশিরভাগ সময় বাবাকে নিয়ে যায় ওরা। স্ত্রী ছিলেন বিদূষী নারী। সভা-সমিতি, নারী সংগঠন, লেখাপড়া, চাকরী ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। সেই সঙ্গে দক্ষ ব্যবস্থাপনায় ঘর-সংসার দেখতেন। তার কোন খুঁত ছিল না। বাবার কাছ থেকে একটি চমৎকার বাড়ি পেয়েছিলেন ধানমণ্ডিতে। তার বাড়ির গোলাপ বাগান মানুষের আলোচনার বিষয় ছিল। সেই স্ত্রী বছর দুই আগে মারা গেছেন। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম নাকি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের চেয়েও বেশি ছিল।

এতকিছু শুনে তনুশ্রীর তৃষ্ণা বেড়ে যায়–ভালবাসার সরোবরে ডুবে যাওয়ার তৃষ্ণা। কলেজে পড়ার সময় একটি ছেলে ওকে ভালবাসার কথা বলেছিল, কিন্তু এমন করে বলার সাধ্য ওর ছিল না। সেইসব কথা তখন শুনতে বেশ ভাল লাগতো, কিন্তু এখন ফখরুলের কথা শুনে মনে হয় কি অবান্তর পানসে কথা ছিল সেগুলো। মনে করলে হাসি আসে। এখন আপন মনে হেসে নিজেকে করুণা করে। শুধু এটুকু নয়, করুণা করার আরও একটি জায়গা আছে ওর। কলেজে পড়ার সময়ই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সেবার কলেজ বন্ধ ছিল। নানার অসুখের খবর শুনে ওর মা ওর কাঁধে সংসারের দায়িত্ব দিয়ে তড়িঘড়ি বাবাকে দেখতে যায়। ছোট পাঁচ ভাই বোনের দায়িত্ব নিয়ে সে বেশ হিমশিম খাচ্ছিল। একদিন রান্না করার সময় জামা এবং ওড়নায় আগুন লেগে ওর দু'হাত এবং ঘাড়-গলা পুড়ে যায়। বেঁচে থাকার কি দীর্ঘ সাধনা করতে হয়েছিল ওকে। এখন ভাবলে শরীর হিম হয়ে যায়। শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণার ভিতরে দুঃসহ দিনরাতের কথা এই মানুষটির সান্নিধ্যে আসার পরইতো ভুলতে পারছে। মানুষটি ওকে এই সবকিছুর বাইরে নিয়ে যায়। বলে, জীবনের কোন পরাজয় নাই। সবটাই অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। এইসব সঞ্চয় তিল তিল করে মানুষের বেঁচে থাকার নানা অর্থ তৈরী করে।

তনুশ্রী আচমকা প্রশ্ন করে, যে ছেলেটি আমাকে ভালবাসার কথা শুনিয়েছিল সে তো একদিনও আমার সঙ্গে দেখা না করে বিনা দ্বিধায় আমাকে ছেড়ে চলে গেলো।

তাতে তোমার কোন পরাজয় নেই। লজ্জা ওর। ছোট হলে ও হয়েছে। ও নিজের কাছ থেকে পালাতে পারবেনা শ্রী। যে আগুনে তুমি পুরে গেছ তারচেয়েও কঠিন আগুনে ও নিজেকে দহন করবে।
সত্যি? ও এমন শাস্তি পাবে?

একদম সত্যি। শাস্তি ও পাবেই শ্রী। তখন তনুশ্রীর মুহূর্তটি হাওয়াই বাজির ফুলকিতে ঝলসে উঠে। সেইসঙ্গে মানুষটির কণ্ঠে শ্রী ডাক ওকে বিমোহিত করে। নিজেকে ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। লোকটার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে হালকা করার সাধ জাগে। কিন্তু কাজটি কঠিন। লোকটি ওই দূরত্ব রাখে।

একদিন তার সঙ্গে একটি পুরো দিন কাটিয়ে বাড়ি ফিরলে মা প্রশ্ন করে, কোথায় ছিলি তনু?
বান্ধবীর বাড়িতে।
কোন বান্ধবী? সবাইকেইতো আমি চিনি।
তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছো?
সরাসরি কথা বলছিস না কেন?
মা প্লিজ, এভাবে আমাকে জেরা করবে না।
একটা ছোট বিষয় জানতে চাওয়া কি জেরা হলো?

তনুশ্রী মায়ের দিকে তাকাতে পারে না। ঘরে ঢুকে দরজা আটকায়। যে ঘরে ওরা চার বোন থাকে। বোনেরা ড্রইংরুমে টেলিভিশন দেখছে। আপাতত কেউ ওকে বিরক্ত করবে না। কিন্তু ওর ভয় করে। মায়ের কাছে ও আজ ধরা পড়েছে। মা যখন জানবে যে, এমন একটি অসম সম্পর্ক নিয়ে ও মেতে আছে তখন মা কি করবে? বলবে কি, একবার পুড়ে গিয়ে লজ্জা হয়নি? আবার আগুনে ঝাঁপ দিয়েছো?

এমন প্রশ্নের উত্তর কি হতে পারে তা ওর মাথায় আসে না। ও বালিশে মুখ গোঁজে। আজ একটি স্বপ্নের দিন গেছে। কাজের লোক দু'টিকে ছুটি দেয়া হয়েছিল। ও রান্না করেছে। মানুষটিকে ভাত মাখিয়ে খাইয়েছে। কত খুনসুটি, কত কথা। কেমন হলো ব্যাপারটা? ও উঠে বসে। পায়চারি করে। দরজাটা হাট করে খুলে দেয়। বাইরে বাবার কণ্ঠ শুনতে পায়। ক্লান্ত এবং বিধ্বস্তকণ্ঠ। ওর সঙ্গে ইদানীং খিটখিটে আচরণ করে। তেমন কোন কারণ নেই। পুড়ে গিয়ে সে তার জীবনের বোঝা বাড়িয়েছে এটিই কারণ।

নিম্নবিত্তের সংসার ওদের। টেনেটুনে দিন যাপন মাত্র। যে মানুষ উপার্জন করতে পারে না সে ছেলেমেয়ের বোঝা বাড়ায় কেন? ও বাবার মুখোমুখি হবে না বলে বাথরুমে ঢুকে। বাবার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণায় মন ভরে যায়। খিটখিটে মেজাজের মানুষটির চক্ষুশূল এখন ও। বাবাওতো পুরুষ। জন্ম দেয়ার সময় ফলাফল মনে রাখেনি। এখন সন্তানের উপর পৌরুষের দাপট প্রদর্শন! যে দুর্ঘটনার জন্য ওর কোন দায় নেই সেটিকে ধরেই ওর জীবনে নরক গুলজার করছে। ও নিজেকেই বলে, প্রতিশোধ নেবো। একদিন এই বাড়িতে ঘোষণা দেবো যে বাবার চেয়ে দ্বিগুণ বয়সী পুরুষকে আমি স্বামী বানাতে পারি। বয়সে কি এসে যায়। হাঃ!

তনুশ্রী ভুলে যায় ওর দগ্ধ শরীরের কথা। মানুষটির পাশে শুয়ে একদিন ও অনুভব করেছিল, জীবনের কষ্টগুলো অনায়াসে দূরে ঠেলে দেয়া যায় যদি ঠিক জায়গা খুঁজে নেয়া যায়। মানুষটি কি প্রবলভাবে বুঝেছিল যে শারীরিক আনন্দ কি। বয়স কোন বাঁধা হয়নি। বার্ধক্য অতিক্রম করার এই জাদুকরী শক্তি ওকে স্তম্ভিত করার পর সেই অঙ্গাকৃতিক শক্তির কাছে নিজের আনন্দ নিবেদন করেছিল ও। বলেছিল, যে সৌন্দর্য আমার কেড়ে নিয়েছ তা আবার অন্যভাবে ফেরত দিয়েছে। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

মানুষটি একদিন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় ধানমণ্ডি লেকের জলের ধারে বসে কণ্ঠে অনেক অনুরাগ ছড়িয়ে বলেছিল,
তোমার জীবনে আমিই তো প্রথম পুরুষ শ্রী?
হ্যাঁ।
ওহ, কি আনন্দ! মনে হচ্ছে আমার সামনে নয়জন মিউজের একজন বসে আছে। আমি কি ভাগ্যবান।

তনুশ্রীর মন খারাপ হয়ে যায়। মানুষটির কণ্ঠে পুরুষের আধিপত্য অনুভব করে ও। বলতে চেয়েছিল, আমি তোমার জীবনে প্রথম নারী নই। তাই তোমাকে নিয়ে আমার সেই আনন্দও নেই। আমি সেই আনন্দ পেতেও চাই না।
কি হলো, তুমি এমন শীতল হয়ে গেলে কেন তনুশ্রী?

আমি তোমার কণ্ঠে আমার বাবার কণ্ঠস্বর শুতে পাচ্ছি।
ওহ, ওই বাজে লোকটির কথা তুমি আমাকে বোল না। ও কোন মানুষই না।

বাবার রূঢ় আচরণের কথাতো ও নিজেই মানুষটিকে বলেছে। হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আসার পরে বাবা ওকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেছিল, তোকে নিয়ে আমি আর পারি না। তুই মরতে পারলি না। এত মানুষ মরে, আর জিব্রাইল তোকে চোখে দেখে না! তনুশ্রী দাঁত কিড়মিড় করে প্রতিজ্ঞা করেছিল, এই দগ্ধ শরীর নিয়েই নিজেকে দাঁড় করাবো। যতদিন সময় লাগে ঠিক ততদিন। তারপর একদিনও এ বাড়িতে না।

ওর এম এ ফার্স্ট পার্ট পরীক্ষা চলছে। ফাইনাল হলে কোন না কোন চাকরীতে ঢুকবে। চাকরী ? ভাবতেই শরীর শক্ত হয়ে যায়। একবার এক শিক্ষকের লিভ ভ্যাকেন্সিতে একটি স্কুলে চাকরী পেয়েছিল। দু'দিন পরই একজন অভিভাবক প্রিন্সিপালকে নালিশ দেয়, এই টিচারের ক্লাশ করতে আমার ছেলে ভয় পায়। এই টিচার থাকলে আমি স্কুলে ছেলে পাঠাবো না।

পরদিন প্রিন্সিপাল কয়েকদিনের বেতন দিয়ে ওকে বলেছিল, শিশুর দিকটিই আমাকে দেখতে হলো। আমি সরি।

তনুশ্রী কথা বলতে পারেনি। কাঁদতে পারেনি। শুধু বুঝেছিল, বাস্তব বড় নির্মম। এই নির্মমতার স্বরূপ ওকে বুঝতে হবে।

তখনও হাতের মুঠোয় ধরা ছিল কয়েকটি টাকা। রাস্তায় নেমে মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি আর সিঙ্গারা কিনে ভাইবোনের জন্য। তরপর বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ায়। পাশ থেকে কেউ একজন মৃদু ধাক্কা দেয় ওকে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে,কাকে ছ্যাকা দিয়েছিলেন যে এসিড খেতে হলো। তনুশ্রী লোকটির দিকে তাকালে লোকটি বলে, ভাগ্যিস আপনার মুখটা বেঁচে গেছে। ভারী সুন্দর দেখতে আপনি। এ ভাবেই মানুষের অনুকম্পা কখনো ওকে স্পর্শ করেছে, কখনো করেনি। বেশিরভাগ সময়ই ও কারও প্রশ্নের উত্তর দেয় না। প্রয়োজনই মনে করে না। ওতো নিজের ভেতরে জগৎ গড়েছে। কত উপকরণ সে জগতে আছে। কোনটা ছেড়ে কোনটা ও আঁকড়ে ধরবে।

কতদিন গড়ালো এভাবে মনে রাখেনি। একদিন পরীক্ষা শেষ হলো তনুশ্রীর। রেজাল্ট হলো। ছোটখাট একটি চাকরী পেলো। ভাবলো, এটুকু নিজের চলার জন্য যথেষ্ট। প্রথম মাসের বেতনটার অর্ধেকের বেশী বাবার হাতে তুলে দিয়ে বললো, এভাবে তোমার ঋণ শোধ করবো আমৃত্যু।
কি বললে? হুংকার দিয়ে উঠে ওর বাবা।
ধমক দিও না। যা বলেছি তুমি তা বুঝেছ।

সবার বিস্মিত-বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে দিয়ে বেরিয়ে আসে তনুশ্রী। রিকশা ধরার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, একদিন এমন রূঢ় ভাষায় সেই মানুষটিকেও সে একটি কথা বলেছিল।

মানুষটি তনুশ্রীর মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। রূঢ় কথা শুনতে তো খারাপ লাগেই। তারপরও সেটা হজম করতে হয়।

তনুশ্রী কখনো নিজেকে প্রশ্ন করেছে, আমি যদি ওকে ভালবাসি তাহলে এমন রূঢ় হই কেন? পুরুষের আধিপত্য কখনো অসহ্য লাগে। ওরা যেটুকু তার চাইতে বেশি নারীর কাছে দাবী করে। ঠিক চিন্তা করেছি কি? বোধহয় ঠিক চিন্তাই করেছি। আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে। বাবা আমাকে ভালবাসার চেয়ে মেজাজ দেখাচ্ছে বেশি। সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে। আমি তার সহানুভূতিই বেশি পেতে পারতাম। পাচ্ছি না । এই যুক্তিহীন রূঢ়তা দিয়ে তিনি আমাকে দমিয়ে রাখছেন। আমি যেন সন্তানের প্রতি তার দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন না তুলি। আর এই মানুষটি কখনো নিজের পাওনাটুকু বড় কঠিনভাবে আদায় করে। সেখানে ভালবাসা খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজের চিন্তাটুকু আত্মস্থ করে তনুশ্রী আকাশ দেখে। বুক ভরে বাতাস টানে। নিজের দগ্ধ শরীরের মতো নিজের দগ্ধ ভবিষ্যৎ অবলোকন করে। ছোট বোন বর্ণিতা মাঝে মাঝে বলে, আপু তোমার জন্য আমার খুব কষ্ট হয়। তোমার যদি বিয়ে না হয় তাহলে আমিও বিয়ে করবো না। আমরা দু'জনে একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকবো। চাকরি করবো। আমরা দু'জনে দু'টো বাচ্চা পালক নেবো। এভাবে আমাদের একটা ফ্যামিলি হবে।

তনুশ্রী বলে, এটা কেমন ফ্যামিলি?

বর্ণিতা হেসে গড়িয়ে পড়ে। ও ভীষণ হাসতে পারে। হাসতে হাসতে চোখ বড় করে বলে,

ফ্যামিলিইতো। তবে মূল ফ্যামিলির মতো নয়। শাখা পরিবার বলতে পারো। মূল ফ্যামিলির ডালপালা আর কি। ব্রাঞ্চ ফ্যামিলি হয় না?

নিশ্চয়ই হয়। হবে না কেন? কতগুলো মানুষের একসঙ্গে থাকা। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোরা। ভালবাসা শেয়ার করা। ভালইতো। কিন্তু আমার জন্য তোকে ভাবতে হবে না। তোকে আমি মূল ফ্যামিলির বাইরে যেতে দেব না। তোর ভাবনা মতো আমিই একটা ফ্যামিলি করবো। তুই আমাকে তোর একটা বাচ্চা দিবি। দিবি না?

উঁহু ,না। তা হবে না। বাচ্চা যদি আমি জন্ম দেই সেটা আর কাউকে দিতে পারবো না। বলতে বলতে হা হা করে হাসে বর্ণিতা। তার চাইতে বাচ্চাই নেবো না। অন্যের বাচ্চা এনে ঘর বোঝাই করবো। যত খুশি তত। মানে আমাদের সামর্থে যে কয়টা পালতে পারবো সে কয়টা।

আবারও হেসে গড়িয়ে পড়েছিল বর্ণিতা। তনুশ্রী ওর কথায় খুব মজা পেয়েছিল। ভেবেছিল বর্ণিতা ওকে সতেজ বাতাস দিয়েছে। চমৎকার স্নিগ্ধ। এভাবে অর্থবহ বাঁচার ধারণা মন্দ নয়। কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে প্রবল একটা ধাক্কা দিয়ে বলেছিল, আমি মূল পরিবার চাই। হোক না বিরাশি বছর বয়স। তাতে কি এসে যায়। ঘরের স্বাদ পাবে, প্রতিদিনের গৃহস্থালির ছবি মন ভরে দেখবে, মানুষটিকে ভাত মাখিয়ে দিলে মানুষটি ওকে এক লোকমা ভাত খাওয়াবে, ও মানুষটিকে এক লোকমা। প্রতিদিন বিছানায় নতুন চাদর পেতে দেবে। সঙ্গে তাজা ফুল। আর কি? ওর চোখ বুঁজে আসে। ও আবেশে দম বন্ধ করে।

দু'দিন পরে ও মানুষটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মানুষটি তখন তার বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় রকিং চেয়ারে দুলতে দুলতে নোরা জোন্সের গান শুনছিল। ও নিঃশব্দে কাছে গিয়ে পাশে–চেয়ারের পাশে মেঝেতে পা গুটিয়ে বসে। রেলিংয়ের ওপাশ থেকে কামিনি ফুলের গন্ধ আসছে। পুরো পরিবেশ দেখে ওর মনে হয় সবটুকুই ওর অনুকূলে। ও আলতো করে হাত ধরলে মানুষটি চমকে উঠে বলে, তুমি।
আমি চলে এসেছি।

চলে এসেছো? মানে?

এখন থেকে আমি তোমার। তোমার কাছে থাকবো।

মানে? আমি তোমার কথা বুঝতে পারছিনা।

মানে তো একদম সোজা। আমার ভীষণ ইচ্ছে হয়েছে তোমার সঙ্গে সংসার করার। আমি ঘর চাই।

ঘর? লোকটা বিমূঢ়ের মতো উঠে বসে। মানে বিয়ে?

হ্যাঁ, তাইতো। বিয়েইতো হতে হবে।

আমি তো আর বিয়ে করবো না। বিবাহিত জীবন একবার যাপন করেছি। আর করতে চাই না। তোমাকে তো আমি শুরুতেই বিয়ে সম্পর্কে ধারণা দিয়ে দিয়েছি। এখন এসব কথা ওঠাচ্ছো কেন?

আমিতো বিবাহিত জীবন যাপন করিনি। আমি সে জীবন যাপন করতে চাই, সে জন্য কথা উঠেছে।

ওহ, শ্রী তুমি আমাকে পাগল বানিয়ো না।

আমি বুঝে শুনে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলছি।
আমি সরি।
মানুষটি চেয়ারের গায়ে মাথা হেলিয়ে দেয়।

হঠাৎ উত্তেজিত হয় তনুশ্রী। চেঁচিয়ে বলে, তুমি এতদিন তাহলে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছো।

আমি তোমার সঙ্গে কোন প্রতারণা করিনি। তুমি নিজের ইচ্ছায় আমার কাছে এসেছো। এখন তুমি লোভী হয়ে উঠেছো।

লোভী ? তনুশ্রী বিস্ময়ে, অপমানে গলা ফাটিয়ে বলে, লোভী? কিসের লোভ?

বিয়ে মানে আমার সঙ্গে তোমার একটি আইনগত ভিত্তি লাভ করা এবং আমার সম্পত্তি দখল।

ওহ, গড!

মানুষটি আকস্মিকভাবে রেগে গিয়ে বলে, তুমি কি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছো?

না।

তবে?

তোমার মুখোসটা তোমাকে ধরিয়ে দিতে চাই।

স্টুপিড মেয়ে, তুমিই আমার কাছে এসেছো।

আর তুমি আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছো। ভাল করেছো। অভিনয় করেছো। তোমার প্রতি আমার আবেগ মিথ্যে নয়। তোমারটা কতটা এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে।

তুমি যদি আমাকে অপদস্ত করার চেষ্টা করো তবে আমি বাধ্য হবো থানায় ডায়রী করতে।

এটাও তুমি ভেবে রেখেছো ?

কোন কোন নারীর কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তো ভেবে রাখতেই হয়।

তনুশ্রীর সামনে পৃথিবীটা প্রবল বেগে নড়ে ওঠে। ও মানুষটিকে দেখতে পায় না। দেখতে পায় তার কুৎসিত নগ্ন শরীর, পোকায় খাওয়া এবং দুমড়ানো।

নুরহাসনা লতিফ*

রোদেলা জীবন

‘বর্ণালী ভিলায়’ আয়োজন চলছে মিলাদ শরীফের।

প্রয়াত রায়হান চৌধুরীর কারণেই এই আয়োজন। শ্বেত-শুভ্র বসনে বসেছিলেন পিনাকী রায়হান। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুরা প্রায় সবাই এসেছে। এমন একটা দিনে ওর কাছে থাকা দরকার। পিনাকী রায়হান বসেছিলেন শ্বেত পাথরের মত। তিনি নির্বাক। কিছুটা এলোমেলো। পিনাকীর পাশেই বসেছিল মোনালিসা। মোনার সাথে বয়সের ব্যবধান অনেক হলেও ওরা বন্ধু। সবসময় যাতায়াত আছে। ফোনে কথা হয়। মোনালিসার স্বামী বিদেশে থাকে। পিনাকীর স্বামী রায়হান চৌধুরী অসুস্থ ছিলেন অনেকগুরো বছর। এ সময়টা পাশে থেকেছে মোনালিসা। মোনা ভাবছে, আজ থেকে পিনাকী আপার কাজ নেই। শেষ যেন হয়ে গেল কষ্টের জীবনটা। পিনাকী মাঝে মাঝেই কাঁদছেন আর বলছেন –

এত অবসর আমি কাটাবো কিভাবে? এত কাজ ছিল, এখন যে কিছুই নেই।

মোনালিসা মনে মনে ভাবে, বার বছর সেবা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিলেন দুলাভাইকে পিনাকী আপা। এও ছিল এক শান্তির জীবন। সেই তুলনায় নিজের জীবনটা কি?

ভালবেসে আদিত্যকে বিয়ে করেছিল মোনালিসা। পাঁচটি বছর ছিল সুখের নদীতে অবগাহন। স্বামীর মত ভাল মানুষ আর হয়না। স্বপ্নের ফাঁক গলিয়ে আলো ঝরেছে ওর জীবনে। ওর কোল জুড়ে এসেছে ছেলে। মৌসুমী আর মোনালিসা দুই বোন। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন ওদের বাবা-মা আর ছোট ভাই। সমস্তসম্পত্তির মালিক ছিল ওরা দুই বোন। বাবা-মা বেঁচে থাকাকালীন বিয়ে হয় মৌসুমীর। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার অনেক পরে মোনালিসার বিয়ের দায়িত্ব পালন করে বড় বোন মৌসুমী।

আদিত্যের সাথে মোনার জানাজানি শৈশব থেকে। থাকতো ওরা পাশাপাশি বাড়িতে। ওদের মেলামেশায় যেমন কেউ বাধা দেয়নি তেমনি বিয়েতেও আপত্তি

* কথা সাহিত্যিক, গবেষক, প্রাবন্ধিক।

করেনি কেউ। পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে ছিল মুঠি মুঠি আনন্দ। এলিফ্যান্ট রোডের একটা ফ্ল্যাটে থাকতো ওরা।
একদিন মোনালিসা বলল, চল আমরা একটা ফ্ল্যাট কিনে ফেলি। উত্তরে আদিত্য বলেছিল, ফ্ল্যাট কিনে টাকা বন্ধ করা যাবেনা এখন। ব্যবসায় টাকাটা খাটাচ্ছি।

আদিত্য একটা এনজিও'র সাথে জড়িত ছিল। মোনালিসা নিশ্চিন্ত ছিল স্বামীর হাতে সমস্তটাকা-পয়সা তুলে দিয়ে। মোনা পড়াতো একটা মেয়েদের কলেজে।

আদিত্য একদিন চট্টগ্রাম যাওয়ার নাম করে চলে গেল অষ্ট্রেলিয়া। ওর সাথে চাকরী করতো মিনা নামের মেয়েটিকে সাথে নিয়ে। সে বিয়ে করেছে মিনাকে। সেই সাথে মুক্তি দিয়েছে মোনাকে। মোনালিসার সমস্তটাকা-পয়সাও সে করেছে আত্মসাৎ। মোনার ছেলের নামে কিছু সঞ্চয়পত্র ছাড়া আর কিছুই নেই এখন ব্যাংকে। মোনার পৃথিবীতে স্বামী ছিল মহামানব। মিনার সাথে প্রেম করেছে সে কথাও জানতো না মোনা। ওর সরল বিশ্বাসের উপর হামলা চালিয়েছে আদিত্য। দিন বসে থাকে না। বয়ে যায় নদীর মতো তরতর করে। আদিত্য চলে যাবার পরও মোনা বেঁচে আছে দু'বছরের স্বপ্নকে নিয়ে। চাকরিটা চালিয়ে গেছে সে।

বাঁচবার অবলম্বন তার আরও একটি আছে। সে তার লেখনি শক্তি। পত্রিকায় নিয়মিত লেখে সে। কবিতার শরীরে পেঁচিয়ে দেয় ওর জীবনের ঘটনাবহুল শাড়ী। গল্পের অবয়বে তুলে ধরে ওর ফেলে আসা প্রেম আর ছন্নছাড়া জীবনের কাহিনী। এতকিছুর পরও মোনা ভুলতে পারেনি আদিত্যকে। আজও আদিত্যের নামে কেউ কিছু বললে সরে যায় সে নিশ্চুপে। নিজের কথায় গল্পের শরীর সাজিয়ে এক সময় কান্নায় ভাসে। তবে মনের সরোবরে পদ্ম ফোটায় স্বপ্নকে ঘিরে। একদিন মনের মতো মানুষ হবে স্বপ্ন। স্বপ্ন'র সুখের 'মা' ডাক মোনার কাজের প্রেরণা।

একজন মেয়ের একা থাকা এ সমাজ গ্রহণ করে না। মোনাও পারেনি একা থাকতে। আদিত্য চলে যাবার পর সে বড় বোনের বাসায় একটা রুম ভাড়া নিয়ে থাকে। ভাড়া দেয়া নিয়ে আপা আপত্তি জানালেও মোনার উত্তর, "অন্য কোথাও থাকলে এর চেয়ে অনেক বেশি ভাড়া দিতে হতো আপা। তার উপর পেতাম না নিরাপত্তা। তুমি আপত্তি করো না আপা। প্লিজ।"

দুলাভাই মানুষটাও ভাল। কখনো আপত্তি করেনি। আপার ছেলে-মেয়েরাও ভালবাসে ওকে। স্বপ্নকে। স্বপ্ন বড় হয় এই পরিবারের স্নেহছায়ায়, পরিবারের সদস্য হয়ে। স্বপ্ন'র কোন আবদার নেই, কোন জেদ নেই। পড়াশুনায় অসম্ভব ভাল সে। স্বপ্নকে নিয়ে মোনার শান্তি অনেক।

জীবনে আরও একজনের ভালবাসা পেয়ে আসছে মোনা। সে এই পিনাকী আপা। দুলাভাই মারা যাওয়ার পর এ বাসায় মোনা বেশি এসেছে পিনাকীকে সঙ্গ দিতে। আপার ছেলেমেয়েরা বাইরে থাকে। আপা অনেক সময় বলেন, ইচ্ছে হয় তোকে

আমার কাছে রেখে দেই। কিন্তু তোর একটা নিজস্ব স্বত্বা আছে। তা নষ্ট হতে দেয়া যায় না। আমারতো সময় শেষ। আল্লাহ আমাকে দিয়েছে অনেক। সে তুলনায় মোনা তুই কিছুই পেলিনা। আদিত্য তোকে ঠেলে দিয়েছে এক অন্ধকার জীবনের দিকে। তবুও যদি ছেলেটা না থাকতো তাহলে হয়তো –
পিনাকীর কথা শেষ না হতে দিয়েই মোনা বলল,

ও কথা বলোনা আপা। আমার জীবনের যে অন্ধকার, তার মাঝে বেঁচে থাকার যে আলোটুকু আমি পাই সে আমার স্বপ্ন'র জন্যই। আমার চলার পথে ও এখন সত্যিই আমার স্বপ্ন। ওর ফুলের মতো মুখটা প্রতিনিয়ত স্বপ্ন দেখায় আমাকে। খুঁজে পাই বেঁচে থাকার অর্থ।

স্বপ্ন'র ভাল নাম অনীত রহমান। বাবার নামের সাথে নাম মিলিয়ে সোমাই ওর এই নাম রেখেছিল।

পিনাকী বলেন, সে যাক। তোকে অন্য রকম কিছু একটা বলতে চাই আমি।

সেটা কি আপা?

বলবো। তবে আরও কিছুদিন পরে। একটু পর্যবেক্ষণ করে।

মোনালিসা ভাবে, ওকে কি বলতে চায় পিনাকী আপা। মোনার ধারণা, পৃথিবীর তাবৎ ওয়েল উইশারদের একজন এই পিনাকী আপা। সে কি তার খারাপ কিছু চাইবেন? প্রতিদিন নামাজের পর একটা দোয়া পড়েন তিনি। মোনা জানতে চেয়েছিল,
এ দোয়ার মরতবা কি আপা?

এটা এমন একটা দোয়া যা পড়লে মানুষ কু-প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকবে। করবে না কারো অনিষ্ট।

সেদিনই মোনা বুঝেছিল আপা কত মহান। নিজে ভাল থাকার জন্য, অন্যের ভালর জন্য কি সাধনাই না তিনি করেন।

সেদিন ভোরবেলা মোনাকে ডাকলেন আপা। "আজ ছুটির দিন স্বপ্নকে নিয়ে চলে আয়। আমার একজন মেহমান খাবে। ভালমন্দ কিছু রান্না করেছি।"– ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় হলো। বাইরে থাকেন তিনি।

আপা বলেন, ইনি সাজিদ সাহেব। অনেক বছর আছেন আমেরিকায়। সম্প্রতি ফিরেছেন দেশে। পরদিন আসল কথা বললেন আপা। "সাজিদকে তুই বিয়ে কর মোনা।"

এটা কি বলছো আপা?

আমি তোকে একদিন বলেছিলাম, একটু পর্যবেক্ষণ করে তবে তোকে একটা কথা বলবো। আমি ওকেই গত এক বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। ওকে জানি আমি

ছোটবেলা থেকে। খুব ভাল মনের ভাল একটা ছেলে। তোর কাছে লুকোবার কিছু নেই। আমেরিকায় থাকা কালে একটা বিদেশী মেয়ের সাথে ওর পরিচয় হয়। ভাল লাগে দু'জনার। বিয়ে করে ফেলে ওরা। কিন্তু অল্পদিনেই ভেঙ্গে যায় ওর সংসার। একটা ছেলে আছে ওর। মায়ের সাথেই থাকে সে। দীর্ঘদিন বিদেশে একা কাটানোর পর সেদিন দেশে ফিরেছে। গুলশানে একটা ফ্ল্যাটও কিনেছে। এখানেই সে আবার বিয়ে করে সংসারী হতে চায়। আমি তোর কথা বলেছি ওকে। ওর অমত নেই। স্বপ্নকে নিতে ওর আপত্তি নেই।

কিন্তু আপা, স্বপ্ন এখন বড় হয়েছে। সে কি তা মানতে পারবে?

সে তুই চিন্তা করিসনে। সে ভার আমার। স্বপ্নকে কাল আমার কাছে রেখে যাবি।

স্বপ্নর সাথে কথা বলেছে পিনাকী। মা'র বিয়েতে স্বপ্নর কোন আপত্তি নেই। বিষণ্ন ভাবে পরিণত বয়সের রূপ নিয়ে স্বপ্ন বলে, মা বলে বাবা বিদেশে থাকে। তিনি বিদেশে আছেন এ কথা যেমন সত্য তেমনি সত্য তিনি আর কখনো আমাদের কাছে আসবেন না। মা এ ব্যাপারে আমাকে কিছু না বললেও আমি বুঝি। অনেকেই মাকে আর আমাকে নিয়ে নানা কথা বলে, হাসাহাসি করে। আচ্ছা আন্টি, মা আরেকটা বিয়ে করেনা কেন?

মা যে তোমার কথা চিন্তা করে বাবা।

আমিও মার কথা ভাবি। মা লুকিয়ে কাঁদে। মাকে আমি সারাক্ষণ হাসিখুশি দেখতে চাই।

তোমার মাকে আবার বিয়ে দিতে চাই।

সত্যি বলছেন আন্টি! আমি আবার বাবা পাবো?

তোমার কোন আপত্তি নেই তাহলে?

মোটেই না। আমি খুশি। খুবই খুশি।

মোনালিসার আবার বিয়ে হয়। অনাড়ম্বর বিয়ে। সাজিদের নতুন কেনা ফ্ল্যাটে স্বপ্নকে নিয়ে নতুন সংসার মোনালিসার। স্বপ্নর স্কুলও পরিবর্তন করে ফেলেছে মোনালিসা। মোনা চায়না স্বপ্ন নতুন করে কোন প্রশ্নের মুখোমুখি হোক। স্কুলে যায় স্বপ্ন সাজিদের গাড়িতে। সাজিদের ব্যবহারে মা ও ছেলে দু'জনই মুগ্ধ। মোনা স্বপ্নকে শিখিয়েছে সাজিদকে আংকেল ডাকতে। বিয়ের পর ওরা অনেক জায়গায় বেড়াতে গেছে। সাথে স্বপ্নও থেকেছে। স্বপ্নর খুব ভাল লাগে। ওর বুকের ভেতরের বাবা না থাকার হাহাকার ভাবটা দূর করে দিয়েছে সাজিদ। স্বপ্নের যেন অনেক দিনের চেনা এই সাজিদ আংকেল। মায়েরও কোন পরিবর্তন হয়নি। আগের মতই মা তাকে সময় দেয়।

পিনাকী আন্টিও ওদেরকে দেখে গেছেন কয়েকবার। সাজিদের আত্মীয়-স্বজনরাও আসে এ বাসায়। ওরাও সবাই স্বপ্নকে খুব আপন করে নিয়েছে। ভালও বাসে ভীষণ। বিশেষ করে সাজিদের মা যখনই আসে স্বপ্নর জন্য নতুন নতুন গিফট নিয়ে আসে। আদর করে বলেন, "দাদু ভাই কেমন আছ।"

স্বপ্ন অবাক হয়। ওর এত বছর বয়সে কেউ ওকে এমন করে আদর করেনি। মাকেও ওরা ভালবাসে–বুঝতে পারে স্বপ্ন। হঠাৎ করে ওদের জীবনে আসা সাজিদ আংকেলকে ভালবেসে ফেলে স্বপ্ন। অবশ্য সাজিদকেও বুঝতে চেষ্টা করে স্বপ্ন। এরই মধ্যে সাজিদের খুশি হওয়ার এবং অখুশি হওয়ার কারণগুলো বুঝে ফেলেছে স্বপ্ন।

মা কলেজে গেছে। এস এস সি পরীক্ষা চলছে স্বপ্নর স্কুলে। তাই স্কুল বন্ধ। সাজিদ ড্রয়িং রুমে বসে পেপার পড়ছিল। কাছে এসে দাঁড়ায় স্বপ্ন। সাজিদ জানতে চায়,
কিছু বলবে স্বপ্ন?

আমি তোমাকে একটা কথা বলবো।

স্বপ্নকে টেনে কাছে বসিয়ে হেসে সাজিদ বলে,
বল কি বলবে।

আমি যদি তোমাকে বাবা ডাকি তুমি রাগ করবে? কেঁদে ফেলে স্বপ্ন।

সাজিদের মনে হলো তার ছেলে 'হার্ট' বুঝি তার পাশে এসে বসেছে। অনেক দিন হার্টকে দেখেনা সাজিদ। খুব দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু দেখার উপায় নেই। এ্যানির কাছে সে আছে। আনন্দে সাজিদ স্বপ্নকে বুকে জড়িয়ে ধরে। প্রচণ্ড আবেগ ভরে বলে,

হ্যাঁ। আজ থেকে তুই আমাকে বাবা বলেই ডাকবি। আমি যে সত্যি তোর বাবা। আল্লাহ-ই এই সম্পর্ক আমাদের মাঝে গড়ে দিয়েছেন। কেউ কোনদিন ভাঙ্গতে পারবেনা আমাদের এই সম্পর্ক। আমি যে তোর বাবা।

মোনা কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে ওরা জানেনা। ওদের সব কথাই শুনেছে মোনা। মোনার ভেতরে বয়ে যায় একটা প্রশান্তির জলধারা। কেটে গেছে ওর জীবনের মেঘ।

রোদেলা জীবনের এই উত্তাপ ওকে কি ভরিয়ে দেবে কানায় কানায়। জীবনের বাকী সময়টা।
ভাবে মোনা।

জে আলী*

আগন্তুক

আর মাত্র তিনজন, এর পরেই ডাক পড়বে আলীমের। আলীম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একাউন্টিং-এ এম বি এ। গতানুগতিক সুদর্শন ওকে বলা যায় না। লম্বায় পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চি, গায়ের রং উজ্জল শ্যাম, হাতুড়ী পেটানো মাংশল শরীর আর চোখে মুখে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের ছাপ। আলীম বসে আছে ৩০/৩ (মতিঝিল বা/এ) এ.এন্ড.এস ডাইং কোম্পানীর এম.ডি'র কক্ষের সামনে। ওর মতো আরও জনা তিরিশেক অপেক্ষায় রত। গত মাসে অর্চনা টেক্স-এর চাকরিটা চলে গেছে বসের সাথে বনিবনা না হওয়ায়। বাবা মারা যাওয়ার পর মা ও ছোট বোন লিপির দায়িত্ব এখন ওর উপর। চাকরি নেই এটা মাকে এখনও জানায়নি। শুধু শুধু বাড়তি একটা চিন্তা মায়ের উপর দিতে চায়নি ও। মাসের পনর তারিখের মধ্যে ওকে বাড়িতে খরচ পাঠাতে হবে। ভার্সিটিতে পড়ার সময় থেকেই ওকে টিউশনি আর নানা ধান্দা করে পড়াশোনার খরচ চালাতে হতো। ছোট বোনের পড়ার খরচও পাঠাতে হয়েছে নিয়মিত। একপেট-আধাপেট খেয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিয়েছে কতদিন। আগাঁরগাও এ 'শান্তিনীড়' নামে যে মেসে ও থাকে সে মেসের ম্যানেজার এ মাসেই মেস ছাড়ার নোটিশ দিয়েছে। একটার পর একটা দুঃশ্চিন্তা পাক খাচ্ছে আলীমের মাথায়।

এই যে ভাই 'রা.বি' কি ভাবছেন? এর পরইতো আপনার ডাক পড়বে। পাশে বসা খাটো মতো লোকটার ডাকে চিন্তায় ছেদ পড়ে আলীমের। এইমাত্র যে ভাইভা বোর্ড থেকে বের হলো কয়েকজন তাকে জেঁকে ধরেছে। "কি কোশ্চেন করলো ভাই", "ভাইভা বোর্ডে কয়জন"–ইত্যাদি ইত্যাদি। একজনের প্রশ্ন শেষ না হতেই আরেকজন জানতে চাইল–"ভাইজান মাল-পাত্তি কত ঢালছেন"। প্রশ্নকর্তা আশেপাশে তাকিয়ে কারো সাড়া না পেয়ে খানিকটা লজ্জা পেলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তরদাতা বললো, ভাইরে চাকরী হবেনা। ম্যাডামের যেই অবস্থা।

---

* প্রভাষক-স্কুল অব বিজনেস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

চাকরিটা পেলেই শালার মিতুকে বিয়েটা করে ফেলবো –বলল আলীমের পাশের জন।

ভাইভা বোর্ডের প্রধান একজন মহিলা কথাটা আলীমের জন্য মোটেও সুখবর নয়। "চুনে মুখ পুড়ে দৈ দেখে ভয়"–কথাটা শুনে এই অবস্থা এখন আলীমের। আলীম নিশ্চিত, আজকের ভাইভা বোর্ডে ঠিকমতো উত্তর করতে পারবে না সে। অথচ চাকরিটা ওর ভীষণ ভীষণ প্রয়োজন। আপনা থেকেই বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল আলীমের।

ডাক পড়লো আলীমের। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে পা বাড়ালো সে। যেহেতু আলীম ধরেই নিয়েছে চাকরিটা ওর হচ্ছে না কাজেই কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে সে। যে কোন কঠিন সমস্যারই পরিণতি মনে মনে মেনে নিলে সেটা থেকে অনেকটা স্বস্তি পাওয়া যায়–ধারণা আলীমের। ভাইভা বোর্ডের ডানদিকে বসে আছে লম্বা গোঁফ ওয়ালা কোম্পনীর দুইজন কর্মকর্তা, বামদিকে ফাইলপত্র সহ একজন এক্সপার্ট। টেবিলের অপর পাশে বসা কোম্পানীর এমডি'র সাথে চোখাচোখি হতেই মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেলো আলীমের। নিজেকে সামলে নিয়ে আসন গ্রহণ করলো আলীম।

আপনার নাম? জানতে চাইলেন একজন কর্মকর্তা।

আবদুল আলীম মণ্ডল। যন্ত্রবৎ উত্তর আলীমের।

এরই মধ্যে এম.ডি খানিকটা অসুসথ বোধ করছেন। একজন জানতে চাইলেন–ম্যাডাম,এ্যানি প্রবলেম? দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে অবসন্নভাবে এম.ডি বললেন, "হঠাৎ মাথাটা কেমন করে উঠল। আচ্ছা ঠিকআছে, আজকের মতো ভাইভাবোর্ড ক্লোজ করে দিন রফিক সাহেব।"

এ.সি রুমেও এ.ডি'র কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের চ্ছটা। দ্বিতীয়বার এ.ডি'র দিকে দৃষ্টি পড়তেই লক্ষ্য করলো আলীম। অসমাপ্ত ভাইভা বোর্ড থেকে বের হয়ে অন্যান্য চাকরি প্রার্থীদের সাথে পায়ে পায়ে বড় রাস্তায় পা রাখলো সে। পকেটে হাত দিয়ে হিসেব করতে চাইলো শেষ সম্বলটুকু। বাহাত্তুর টাকা পঞ্চাশ পয়সা। পাশের গলিতে ঢুকে একটা নেভি সিগারেট ধরালো। খিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। আরেকবার পকেটে হাত দিলো আলীম। না উপায় নেই। হোটেলে ঢুকে পর পর দুই গ্লাস পানি ঢাললো পেটে। তলপেটে গুড়গুড় ডাক দিতেই চেয়ার টেনে বসে পড়লো। পুরাতন আমাশয় কদিন থেকেই নতুন করে জানান দিচ্ছে। খাওয়ার অনিয়মে গ্যাষ্ট্রিকও বাড়ন্ত প্রায়। বিচ্ছিন্ন কিছু প্রাসঙ্গিক সৃতিতে ভেসে যাচ্ছে আলীম। হোটেলের যান্ত্রীক শব্দগুলো থেকে সে এখন তিরোহিত। নিজস্ব ভাবালুতায় মগ্ন। মাত্র কয়েকটা বৎসরের ব্যবধান। সেই প্রথম যেদিন ভার্সিটির প্যারিস রোড দিয়ে সিনেট ভবনের

বারান্দায় ওকে নিয়ে বসলো জেনি। তারপর অনেক অ-নে-ক কিছু। ইচ্ছে করেই নিজের স্বাতন্ত্রকে জিইয়ে রেখেছে আলীম। মাত্র বাহাত্তুর টাকা পঞ্চাশ পয়সা পকেটে। ছন্নছাড়া বেকার জীবন। অথচ একটু ছাড় দিলেই - - - -। না। কোন আফসোস নেই। আছে শুধু প্রশান্ত চিত্ত আর নিশ্চিন্তে নির্ভর করার মত আত্ম বিশ্বাস। মেসের দিকে পা বাড়ালো আলীম।

গাড়ীর হর্ণ বাজার শব্দে সাত সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেল শান্তিনীড় মেসের ম্যানেজার শহীদ মিয়ার। অসম্ভব বিরক্তি ভরে মুখটাকে যথাসম্ভব বিকৃত করে গেটের দিকে এগিয়ে গেল সে। গেট খুলে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে জানতে চাইলো–"কারে চান?" ঘুমের রেশ তখনো পুরোপুরি কাটেনি হতভাগ্য শহীদ মিয়ার। অন্যথায় সে ভীমরি খেতো এই সকাল বেলা তারই সামনে দাঁড়ানো অসম্ভব সুন্দরী এই আগন্তুককে দেখে।

আলীম সাহেবকে একটু ডেকে দেয়া যাবে? বললো আগন্তুক।
আলীম স্যারের কাছে আইছেন? উনিত রাইতের বেলা গাট্টিবোচকা লইয়া মেস থেইক্যা ফুটছে।
মানে?

জ্বী ম্যাডাম। গত মাস থেইক্যা ওনার চাকরি নাই। অবস্থা কাহিল। পর পর দুই মাসের মেস ভাড়া বাকী। তাই এই মাসে মেস ছাড়ার নোটিশ দিছিলাম।
ওনি কোথায় গেছেন ঠিকানাটা যদি –

সরি ম্যাডাম। উনিত কোন ঠিকানা রাইখ্যা যান নাই। তবে চাকরি পাইলে মেসের ভাড়া দিতে আসবো। পয়সা না থাকলেও মানুষটা খাসা। নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দিল শহীদ মিয়া।

জগতের সকল ঐশ্বর্য ও যাবতীয় সম্পদের চেয়েও মহামূল্যবান কোন একজন বেদনাময়ী প্রেমিকার একবিন্দু চোখের জল। আগন্তুকের চোখে মার্কারির সানগ্লাস থাকায় শহীদ মিয়া সেই ঐশ্বর্যময় দৃশ্য হতে দ্বিতীয়বার বঞ্চিত হলো।
শুধু চোখে পড়লো বেদনা সিক্ত কুকড়ে যাওয়া একটি মিষ্টি অবয়ব।

রিটা আশরাফ*

তূর্যকে লেখা মায়ের চিঠি

স্নেহের তূর্য /

আমার অনেক অনেক আদর নিও।
ভালবাসা নিও।
অনেক অনেক স্নেহাশিষ নিও।

কেমন আছো বাবা? বৌমা কেমন আছে। টুসি দাদুমনি আমার ভাল আছে তো? আমার বংশের একমাত্র প্রদীপ। আমাকে যুগান্তরে বয়ে নিয়ে যাবার একমাত্র বৈঠা। দাদুমনি আমার কখনো মন খারাপ করে থাকে নাতো? আমার হয়ে আমার দাদুমনির দু'গালে তুই আর বৌমা মিষ্টি করে দুটো চুমু খেয়ে দিস্।

বাবা তূর্য, আজ সকাল ছ'টায় তোদের সাথে কথা হলো। অনেকক্ষণ ধরে। কুশলাদি বিনিময় হলো। ভাল-মন্দ জানা হলো। সমস্যা-সমাধান নিয়ে আলোচনা হলো। তোদের ওখানকার আর আমাদের এখানকার নানা বিষয় নিয়ে জানাশোনা হলো। এখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। না না, ঠিক সন্ধ্যা নয়। সন্ধ্যা বিকেলের মাঝামাঝি। গোধূলি লগন। পশ্চিমাকাশ লালচে রঙের উপর ছোপ ছোপ সাদা বুটিতে চমৎকার একটা শাড়ি পড়ে আছে। দক্ষিণধারের আম গাছের নীচে দোলনাটায় বসে সে দৃশ্য দেখছি আর ভাবছি তোর কথা। সকালবেলা তোদের সাথে টানা এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট পয়তাল্লিশ সেকেন্ড কথা বলার পর এখন বেলা ছ'টা বেজে পঁচিশ মিনিট পার হয়ে যাচ্ছে। সময়টাকে বিকেল কিংবা সন্ধ্যা বললাম না। কারণ এখন সন্ধ্যাও নয়, বিকেলও নয়। এখন গোধূলি লগন। আর সময় উৎক্ষেপণের বেলায় আমরা এখনও গোধূলি লগন বলে অভ্যস্ত নই। তাই অভ্যস্তহীনতার বাক্য কিংবা শব্দ উচ্চারণকালে ব্যবহারের সময় আমরা যথেষ্টই জড়তা বোধ করি। তাছাড়া, গোধূলি লগন শব্দটি আমাদের শহুরে জীবনে তেমন প্রযোজ্যও নয়। এখানে বিকেল কিংবা সন্ধ্যা বললেও সময়ার্থের কিংবা বাক্যার্থের তেমন হেরফের হবে বলে আমার মনে হয় না।

---

* কথা সাহিত্যিক ও সহকারী অধ্যাপক, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অ বাংলাদেশ।

মনে আছে তোর, তুই তখন সে-ই ছোট্টটি ছিলি। কোন ক্লাশে পড়িস তখন? সপ্তম কিংবা অষ্টম শ্রেণীতে। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে। আমরা তখন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক কোয়ার্টারে থাকতাম। তোর বাবা একদিন ইউনিভার্সিটির ক্লাশ শেষ করে ঘরে ফিরতেই তুই দাদু বাড়ি যাবার বায়না ধরলি। পরেরদিন ক্লাশ আছে বলে তোর বাবা তোকে এ বায়না থেকে নিবৃত করার চেষ্টা করলেন নানাভাবে।

কিন্তু নাছোড়বান্দা তুই। কেঁদে কেঁদে একাকার করে ফেললি। পরে বাধ্য হয়ে সেদিনই চারটার দিকে আমরা রওনা হলাম। যাত্রা বেশি সময়ের ছিলনা। বাসে উঠে মাত্র এক ঘন্টার পথ। বাস থেকে নেমে আর কোন যানবাহনের পথ ছিল না। পুরু পৌণে এক মাইল হেঁটে গিয়ে তোর দাদুর বাড়ি। আমরা হাঁটা ধরলাম। গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ ধরে। বন্ধুর সে পথ। তুই বারবারই হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলি। তোকে টেনে তুলতে গিয়ে দু'বার আমার হাত থেকে ব্যাগ পড়ে গিয়েছিল। উঁচু রাস্তা থেকে একেবারে নীচে। ক্ষেতের মধ্যে। তোর পা-ও বেশ কয়েক জায়গায় ছিলে গিয়েছিল। রাস্তার দু'ধারে সদ্য কাটা ধানক্ষেত। দেখতে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজানো মুখের মতো। দিগন্ত প্রসারিত সে ফাঁকা মাঠ। হাঁটতে হাঁটতে বেলা পড়ে আসছিল। পশ্চিমাকাশ রাঙিয়েছিল ঠিক এই মুহূর্তের আকাশের মতো। মাঠে ছড়ানো ছিটানো গরুর পাল। সাথে রাখাল।

রাখালরা সব তখন গরুর পাল পেছন থেকে ধাওয়া করে ঘরে ফিরছিল। গরুর পালের খুড়ের আঘাতে মাঠের ধুলো উড়ে চারপাশটা কেমন ধোয়াটে হয়ে গিয়েছিল। মনে আছে সে দৃশ্য তোর খোকা? তুই আমাকে বলেছিলি,
মা, দেখ দেখ কি সুন্দর!
তোর বাবা তখন তোকে বলছিলেন,
এ সময়টাকে কি বলে জান তূর্য?
তুই বলেছিলি,
কি বলে বাবা?
গোধূলি লগন।
তুই আবার জানতে চাইলি-
গোধূলি লগন কি বাবা?

তোর বাবা তখন ইউনিভার্সিটির শিক্ষকের মতই তোকে বোঝাতে লাগলেন, গোধূলি লগন হচ্ছে সন্ধ্যা বিকেলের মাঝামাঝি একটা সময়। তবে সন্ধ্যাও না বিকেলও না। গোধূলি হচ্ছে সায়ংকাল। অর্থাৎ সূর্যাস্তকাল। যখন গরুর পাল ধূলি উড়িয়ে ঘরে ফিরে। আর লগন হচ্ছে সূর্যের এক রাশি থেকে আরেক রাশিতে গমনের কাল। ঐ যে দেখছো, রাখালেরা গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফিরছে, চারপাশ কেমন ধোঁয়াটে হয়ে

গেছে গরুর খুরের আঘাতে ধুলা উড়ে উড়ে, পশ্চিমাকাশ কি অদ্ভুত সুন্দর রঙে রাঙিয়ে উঠেছে, এই সময়টাই হলো গোধূলি লগন।

গোধূলি লগন পার করে সন্ধ্যার সময় আমরা গিয়ে উঠলাম তোর দাদুবাড়ি। আর সে কি হৈ-চৈ পড়ে গেল সারা বাড়িময়। আমাদের সাথে দু'দণ্ড কথা বলার সময় পেলো না কেউ। তোর দাদু আমাদের ঢুকতে দেখেই মোরগের খোঁয়ার থেকে মোরগ ধরতে গেল। তোর দাদা গেল ডিম খুঁজতে। তোর বড় চাচী মাটির চুলায় ভাত চড়িয়ে আগুন জ্বেলে দিল। তোর ছোট চাচীর তখন প্রচণ্ড জ্বর। সেই জ্বর নিয়েও সে উঠে এসেছিল অতিথি আপ্যায়নে। তারপর ওকে জোড় করেই আবার শুইয়ে দিয়েছিলাম আমি আর তোর বাবা। তবুও ওর সে কি আপত্তি। জ্বর নাকি তেমন একটা নেই গায়ে। অথচ আমি ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখেছিলাম জ্বর তখন একশ তিন কি সাড়ে তিনেরও বেশি হবে। সবাই আমাদের খাবার-দাবার নিয়েই মহাব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মনে আছে তোর তূর্য, সেদিন তোর দাদু মুরগীর খোঁয়ারে মুরগী ধরতে গেলে কি এক মজার কাণ্ড ঘটেছিল। প্রথম সব মুরগীগুলো একসাথে কুক-কুক-কুককুরু-ও-ও-ও কুও, কুককুরু-ও-ও-ও কুও ডাক ছেড়ে সন্ধ্যার শান্ত পরিবেশটাকে এক্কেবারে গরম করে তুলেছিল। তোর দাদু কিছুতেই পারছিল না একটা মুরগী ধরতে। ওরা যেন সব পরামর্শ করে গোল্লাছুট খেলছিল তোর দাদুর সাথে। তারপর তোর দাদুর হাতের ফাঁক গলে একে একে সবকটা মুরগীই বেরিয়ে গিয়েছিল বাইরে। তারপর সেকি হুলুস্থুল! কখনো মনে হচ্ছিল ঈদ বাড়ি, কখনো মনে হচ্ছিল ঝগড়াটে বাড়ি। সে রাতে আমাদের জন্য আর মুরগী ধরা গেল না। এজন্য তোর দাদুর যে কি হাপিত্যেস! রাত দশটার দিকে ভাত খেতে বসলাম আমরা। ডিম ভূণা, মাখা ডাল, করলা ভাজি আর বেগুনের সাথে পুঁঠি মাছের ঝোল দিয়ে। ঘুমাতে গেলাম আমরা অনেক রাতে। অবশ্য সে গ্রামের হিসেবে। শহরেতো রাত এগারটা বাজলে রাত তখন সবে শুরু হয়। আর তোদের গ্রামে তখন ছিল মধ্যরাত। নিশুতি রাত। কোথাও থেকে ভেসে আসছিল শিয়ালের কোরাস, আবার কোথাও থেকে ভেসে আসছিল কুকুরের মিহি সুরের গান। কিন্তু মানুষের কোন সাড়াশব্দ আসছিল না কোথাও থেকেই।

আকাশে সেদিন জ্যোৎস্না ছিল। স্নিগ্ধ আলোর বন্যায় ভেসেছিল চারদিক। তোদের গ্রামে তখন বিদ্যুৎ ছিল না। কিন্তু জ্যোৎস্নার আলোতে বিদ্যুতের অভাব তেমন

অনুভূত হয়নি। আমি, তোর বাবা আর তুই যে ঘরটাতে শুয়েছিলাম সে ঘরটা ছিল টিনের। টিনের চালের মাঝে মাঝেই ফুটা ছিল। সিলিং ছিল না। চালের সেই ছিদ্র দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ছিল আমাদের চোখে, মুখে, গায়ে। বাতাসের দোলায় সেই বুটি বুটি আলোও দোল খাচ্ছিল এধারে-ওধারে। কি যে অদ্ভুত সুন্দর! সেই সুন্দরের মাঝে ঘুমিয়ে ছিলাম আমরা। কাকডাকা ভোরে ঘুম ভেঙ্গেছিল আমাদের। টিনের বেড়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে আলো এসে ঘরের অন্ধকার ধুয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বালিশের নিচ থেকে ঘড়ি টেনে দেখি মাত্র সাড়ে পাঁচটা বাজে। দরজা খুলে বাইরে এসে আরো অবাক হলাম। চারপাশে তখন দুপুরের ইমেজ। হাসি পেয়েছিল বড্ড আমার। আমাদের ঢাকায় তখন সকাল হতে শুরু করত আটটার পরে আর রাত হতে শুরু করত দশটা-এগারটার পরে। যা এখনও বর্তমান।

রান্নাঘরের দিকে গেলাম। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েই আমার দুই চোখতো চড়কগাছ। তোর দাদু আর বড় চাচী মিলে তখন এক বল তেলের পিঠা ভেজে ফেলেছেন। ভাঁপা পিঠা, চিতই পিঠা আর মেড়া পিঠা হয়ে গিয়েছিল সাতটা বাজার আগেই। আমিও গিয়ে বসেছিলাম ওদের পাশে। কিন্তু তোর বড় চাচী আর দাদু আমাকে কিছুতেই হাত দিতে দিলেন না। তুইও সেদিন ঘুম থেকে উঠেছিলি অনেক আগেই। যে তোকে ঢাকায় আটটার আগে কখনোই ঘুম থেকে তোলা যায়নি, সে-ই তুই-ই সেদিন ছ'টা বাজার আগেই ঘুম থেকে উঠে সারা বাড়িময় মাতিয়ে তুলেছিলি লাফালাফি করে।

তোর দাদু বাড়িটা তখন কেমন ছিল মনে আছে তোর খোকা? তিনটে ঘর ছিল তিনদিকে। তার মাঝে একটা ঘর পুরোটাই টিনের ছিল, আর দু'টো ছিল টিনের চালের নিচে চারদিকে মুলির বেড়া। রান্না ঘরের চালটা ছিল ছন দিয়ে তৈরী। আর চারদিকের বেড়া ছিল শোলার। লেট্রিনটা ছিল বেশ দূরে। জঙ্গলের ভেতর। ঐ লেট্রিনটা ঘিরেও কিন্তু তোর একটা মজার ঘটনা আছে। ভুলে গেছিস্ খোকা? টিনের বেড়ার ভেতর দু'পাশে দু'টো কাঠের তক্তা মাটি থেকে বেশ একটু উপরে শুইয়ে দেয়া হয়েছিল খুঁটিতে ভর দিয়ে। তার মাঝখান থেকে চারপাঁচ হাত লম্বা টিনের টুই পেছন দিকে বিরাট এক গর্তের মুখে নিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। বিশাল একটা গাছের গুড়ি ফেলে সিঁড়ির কাজটা সারা হয়েছিল। সকালবেলা সেই লেট্রিনে গিয়ে তুই টিনের টুই সহ ভেঙ্গে পড়েছিলি নিচে। মনে আছে খোকা তোর ? আর সে কি হুলুস্থুল কাণ্ডটাই না ঘটে গিয়েছিল সকাল বেলাতেই। তোর দাদা বাড়ি ছিল না। সাত সকালবেলা নামাজ পড়েই ব্যাগ হাতে বের হয়ে গিয়েছিল বাজারে। আমাদেরকে নদীর টাটকা মাছ খাওয়াবে বলে।

বাড়ির দক্ষিণ দিকে বেশ একটু দূর দিয়েই বয়ে গিয়েছিল ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা নদী শীর্ণ শরীর নিয়ে। নদীটা কি এখনো আছে খোকা? জানিস্ তুই? মনে হয় নেই। ভরাট হয়ে গিয়েছে। সেই নদীতে খড়া পাতা থাকতো। খুব সকালবেলা সেই খড়া থেকে পাওয়া যেত নানা ধরনের ছোট ছোট টাট্কা মাছ। একেবারে প্রাণসহ তাজা মাছ। তোর দাদা সেই মাছ আনার জন্যই বেরিয়ে গিয়েছিল সাত-সকালবেলা।

এদিকে তুই কি কাণ্ডটাই না বাধালি। জামায়, গায়ে এক্কেবারে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। সবাই তখন পিঠা বানানোর কাজ রেখে তোকে নিয়েই ব্যাস্তহয়ে পড়েছিল। তোর দাদু সাবান নিয়ে এল। তোর বড় চাচী গামছা, বালটি নিয়ে এল। আর তোর বড় চাচাতো তোকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এক্কেবারে পুকুরঘাটে দাঁড় করালো। পুকুরের খোলা জলে তোকে ধুইয়ে শুদ্ধ করে নিয়ে এলো। অসুখ শরীর নিয়ে ছুটে এসেছিল তোর ছোট চাচীও। আর তোর চারটে চাচাতো ভাইবোনদের কাণ্ড কি ছিল মনে হলে এখনো হাসিতে দম আটকে আসে আমার। তুই বাড়িতে যাবার পর ওরা শুধু লুকিয়েই থাকতো। লজ্জায়, জড়তায় একেবারে গুটিসুটি মেরে। তোকে ওরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছিল না। তুই যেন ভিণ্ কোন গ্রহ থেকে ওদের মাঝে গিয়ে পড়েছিস্। আর সেই ওরা তোকে লেট্রিনের ভেতর ওভাবে পড়ে যেতে দেখে এক্কেবারে হেসে কুটিকুটি। অবশ্য তাও ছিল আড়াল থেকেই। আর খানিক পরপর এসে মার কানেকানে কি যেন গোপন কথা। আমরা ওদের জন্য নতুন জামা কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের সামনে ওরা লজ্জায় সেসব ধরলই না। আর যেই আমরা আড়াল হই অমনি চার ভাই-বোনের নতুন জামা নিয়ে সেকি আনন্দ।

তোর বাবাও যেন সেদিন গাঁয়ের সাথে মিশে গিয়েছিল। সকালবেলা উঠেই বের হয়ে গিয়েছিল পাড়া-পড়শিদের কুশলাদি জানার জন্য। সারা গ্রামটা ঘুরে দশটার দিকে বাড়ি ফিরে এল। পাঁচ রকমের পিঠা নিয়ে সামনে দিতেই বললো, আমিতো খেয়ে এসেছি। ছলিম চাচার বাড়ি থেকে শুটকি ভর্তা দিয়ে খুঁদের ভাত। আনিস চাচার বাড়ি থেকে পুলি পিঠা, আরো অনেক বাড়ি থেকে অনেক কিছু। শুনেই আমার গাটা জ্বলে উঠল। তোর দাদু তোর চাচী আযানের সময় উঠে যে পরিশ্রম করলো তার কোন মূল্যই দিলনা তোর বাবা। তোর দাদু কিন্তু একদম রাগ করলেন না। তোর বাবাকে কিছু বললেনও না। আমাকে রাগ করতে দেখে শুধু বললেন, থাক মা। এতদিন পড়ে গ্রামে এল। গ্রামের সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করতে গেলে কিছু না খেলে হয না। এটা আমাদের গ্রাম্য রীতি। একটু পরে না হয় খাবে।

দশটা বাজার খানিক পরেই বাজার থেকে এলেন তোর দাদা। হাতে পেট ফুলানো ব্যাগ। ভেতর বাড়িতে ঢুকেই উঠোনে ব্যাগটা উপুড় করে ঢেলে দিলেন। সে কি দৃশ্য! পুঁঠি, কৈ, টেংরা, ভেড়া, বাইম, চিংড়িসহ আরো বেশ কয়েক রকমের মাছ ভীষণভাবে ছট্ফট্ করছিল। এ যেন ওদের বাঁচার আকুলতা। ভীষণভাবে। কিন্তু

ওরা আসছেই জবাই হতে। বাঁচাবে কে? তোর দাদাতো বাড়ির ভেতরে ঢুকেই তূর্য তূর্য করে এক্কেবারে একাকার। তোকে সেই মাছের পাশে দাঁড় করিয়ে চিনাতে লাগলেন কোনটা কোন মাছ।

আমার যে কি ভাল লাগছিল সেই দৃশ্য। তোর আব্বুর আড়াইটায় ইউনিভার্সিটির ক্লাশ ছিল একটা। সেজন্য এগারটার দিকেই রওনা হবার কথা ছিল আমাদের। কিন্তু সেই মাছ কাটা, ভাজা, পোলাও রান্না করা, মুরগীর কোরমা এসব করতে করতেই তোর দাদু আর চাচীর বেলা হয়ে গেল প্রায় তিনটে। তার উপর তোর দাদা, দাদু, চাচী সবার বারণ।

সেই ভাজা মাছ খাওয়ার কথা ভুলে গেছিস্ খোকা? রান্নাঘরের বাইরে একটা দুই মুখওয়ালা চুলা ছিল। খোলা আকাশের নিচে। মাথার উপর ঝাঁঝাঁলো রোদ ছিল তখন। সেখানে বসে এক চুলাতে তোর চাচী ভাত, পোলাও, কোর্মা এসব রান্না করছিল আর অন্য চুলায় তোর দাদু পুঁঠি মাছ, ভেড়া মাছ ভাজছিল। একটাই মোড়া ছিল তখন তো দাদুর বাড়িতে। সেই মোড়াটা তোর চাচী এনে দিল আমাকে বসার জন্য। কিন্তু তুই দিলিনে। শেষে তুই বসলি মোড়াতে আমি পিড়িতে। তোর বাবাকে আশেপাশে অনেক ডাকাডাকি করেও কোথাও পাওয়া গেল না। আবার বেরিয়েছিল গ্রাম্য সংযোগ সাধন করতে। ঝাঁঝাঁলো রোদের নিচে সেই চুলার পাড় বসে গরম গরম ভাজা মাছ খাওয়া। আহঃ! এখনো জিভে পানি এসে যাচ্ছে। তুই সেদিন কয়টা ভাজা মাছ খেয়েছিলিরে খোকা? মনে আছে তোর? আমার কিন্তু আজও মনে আছে। বলব? লজ্জা পাবি নাতো! সেদিন তোর একের পর এক ভাজা মাছ খাওয়ার হিসেবটা শুধু আমিই করেছিলাম হয়তো। তোর চাচাত ভাই-বোনগুলোও করেছিল কি? ওরাতো অবশ্য তখন ধারে কাছে ঘেঁষতেই সাহস পায়নি। যদি লুকিয়েও আশপাশে সেদিন ওরা থেকে থাকে তাহলে আজও ওরা নিশ্চয়ই হেসে কুটিকুটি হয়। বলেই ফেলি সেদিন কটা ভাজা মাছ সেদিন তুই খেয়েছিলি। পুঁঠি মাছ খেয়েছিলি বাইশটি, ভেড়া মাছ পাঁচটি, টেংরা মাছ এগারটি। দেখিস্ বাবা, এ হিসেব কিন্তু আবার আমার দাদুমনিকে জানাস্নে যেন। তাহলে তোর আর রক্ষে থাকবেনা। সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানিস্, তোর দাদু যখন বারবার তোকে বলছিল, আরেকটা খাও দাদুমনি। এই যে, এই শের পুঁঠিটা খাও। ঢাকায় এমন মাছ পাবে কোথায়? ঢাকায় এমন তাজা মাছ পাওনা বলেই তো এখানেও খেতে পারছনা। তুমিতো খাচ্ছই না দাদুমনি। শুধু শুধুই তোমার জন্য কষ্ট করছি। এই যে এই ভেড়াটা নাও।

আমি তখন মনে মনে আল্লাহর কাছে দোয়া চাচ্ছিলাম, তোমার পেটটা যেন খারাপ না করে। আর তোমার দাদুর এই ভালবাসার আবদারের মুখে তোমাকে আর খেতে মানা করতেও পারছিলাম না। আমার দোয়া বোধহয় আল্লাহ শুনেছিলেন। তাই

তোমার পেট অবশ্য খারাপ করেনি তবে ফল হয়েছিল একটা। সেটা হল সেদিন দুপুরে আর তুমি ভাত খেতে পারোনি এতটুকুও। সবাইতো অস্থির । কেন খেতে পারছোনা। আর আমি মনে মনে আল্লাহকে ডেকে অস্থির, তুমি যেন আর কিছু না খাও এ বেলা।

তোমার বাবা ঘরে এলেন দুপুর দু'টোর পর। ভাত খেতে খেতে আমাদের তখন চারটা বেজে গেল প্রায়। তোমার বাবা তৈরী হবার জন্য তাড়াহুড়ো শুরু করে দিলেন। পরদিন সাতটায় নাকি তোমার বাবার ক্লাশ আছে। কোন রকম আধা খেচড়া করে গুছিয়ে ভেতর বাড়ি থেকে বের হয়ে আসলাম আমরা। সবার মন খারাপ। তোমার দাদুতো তোমাকে ধরে কেঁদেই ফেললেন। সবাই রাস্তায় উঠার মুখ পর্যন্ত এল আমাদের এগিয়ে দিতে। তোমার দাদা, দাদু, চাচা, চাচী, চাচাত ভাই-বোনেরা সবাই। তোমার ছোট চাচীও এল। তোমার জন্য তোমার দাদু ভাজা মাছ পুঁটলি বেধে সাথে দিয়ে দিল। পিঠা দিল। নারকেল, খুঁদ, গাছের কলা আরো কত কি দিল। তোমার চাচাত দু'ভাই অতি উৎসাহে সেসব বয়ে নিয়ে আসতে লাগলো আমাদের সাথে সাথে।

দিগন্ত প্রসারিত মাঠের মাঝে রাস্তার মুখে এসে দাঁড়ালাম আমরা। এখান থেকেই বিদায় যাত্রা। একটু দূরেই রাস্তার দু'পাশে থেকে থেকে গরুর পাল। লাঠি হাতে রাখাল। বাঁশিও আছে কারো কারো হাতে। সেই বাঁশিতে উঠছে তাদের কষ্টের সুরের মূর্ছনা। সেদিকে তাকিয়েই লাফিয়ে উঠলে তুমি। আজও গোধূলি লগন দেখবে বলে। না দেখে যাবেই না তুমি। তোমার আব্বুতো রেগে-টেগে আগুন। রাগে ফুঁসে উঠে বললেন –

ঠিকআছে। তুমি তোমার আম্মুর সাথে থাকো। আমি দু'দিন পর এসে নিয়ে যাবো। আর দাদা চাচাতো আছেই। ওদের সাথেই দেখতে পাবে গোধূলি লগন।

বেঁকে বসলে তুমি। বললে,
তোমাকেও থাকতে হবে। থাকতেই হবে। নইলে ঢাকায়ও যাব না আমি। গোধূলি লগনও দেখবো না। ভাত খাব না। কিচ্ছু করব না। কিচ্ছু করব না আমি।

কেঁদে কেঁদে একাকার করলে তুমি। তোমার চাচাতো ভাই-বোনেরা তোমার কান্না দেখে যেন মজাই পাচ্ছিল খুব। ওরা হয়ত তখন ভাবছিল, এত্ত বড় পোলা কেমনে কান্দে। শরমও নাই।

তোমার দাদা-দাদু, চাচা-চাচী সবাই পক্ষ নিল তোমার। শেষে পণ্ড হলো আমাদের ঢাকায় ফেরা। জিত হলো তোমারই। আবার ঘরে ফিরে গেলাম আমরা। বিকেল তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা। তোমার বাবা ঘরে ঢুকেই রাগের চোটে শুয়েই এক্কেবারে

ঘুমিয়ে পড়লো। গভীর ঘুম। তুমি আমাদের সাথে ঘরে ফিরলে না। দাদুর হাত ধরে বেরুলে জনসংযোগে। তোমার দাদুর বাড়ির পেছনে পুকুর ছিল একটা। চারপাশে আম, কাঁঠাল, তাল, কদম, কড়ই, লিচুগাছ সারি সারি। তার কিছুদূর পরেই অন্য একটা পাড়া। মাঝের ফাঁকা জমিতে তখন সরষে ফুলের বাগান। সরষে চাষের সময় ছিল না তখন। তবুও ওগুলো বেশ চমৎকারভাবে বেড়ে উঠেছিল কৃষকের অতি যত্নে। হলুদ চাদরে ঢাকা মাঠটাকে কি যে সুন্দর লাগছিল তখন। তোর দাদু, চাচী আর আমি পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম সে দৃশ্য।

জানিস্ তূর্য, সেই তখন-তোদের সারা গ্রামে একমাত্র তোর বাবাই ছিল উচ্চ শিক্ষিত। বড় চাকুরিওয়ালা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। গ্রামের মানুষ তাই তোর দাদাকে অতিমাত্রায় ভক্তি শ্রদ্ধা করতো। গ্রামের যে কোন শালিসে তোর দাদা না থাকলে বিচারের রায় ওদের শুদ্ধ হতো না। তোর দাদাও পড়াশুনা জানতেন। তবে মেট্রিকের উপরে নাকি আর যেতে পারেননি। দু'বার পরীক্ষা দেয়ার পর সংসারের হালকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। তোর দাদার তিন ছেলের মাঝে একমাত্র তোর বাবাই উচ্চশিক্ষার নাগাল ধরতে পেরেছিলেন। অবশ্য সেজন্য নাকি তোর দাদার বাড়িতে কিংবা তোদের গ্রামে তোর বাবার প্রতি সবার ভালবাসাই ছিল অন্য রকমের। সবাই আদর করে তোর বাবাকেই বেশি কাছে ডাকত। কথা বলত। তোর বাবাই এসব বলেছিল আমাকে।

আমার কি মনে হয় জানিস্ খোকা, এই যে তোর বাবা এত মেধাবী ছাত্র ছিল এর পেছনে পুরুটাই ছিল আল্লাহর সু-দৃষ্টি। নইলে যে গ্রামে একটা ভাল স্কুল ছিল না, কলেজ ছিল না, শিক্ষিত মানুষ ছিল না, সেই গ্রাম থেকে কেমন করে, তোর বাবা পঞ্চম শ্রেণীতে, অষ্টম শ্রেণীতে টেলেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিল। এস এস সি এবং এইচ এস সি তে প্রথম বিভাগ পেয়ে একেবারে একলাফে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। তারপর কেমন করে একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। একেই কি গোবরে পদ্মফুল ফোটা বলে? তুই আবার কিছু মনে করছিস্ নাতো খোকা? তবে তোর ব্যাপার কিন্তু আলাদা। তোর বাবা মেধাবী, তোর মা-ও কম যায় না। হেসে ফেললি নাতো আবার!

সেদিন তারপর সেই পুকুর পারে দাঁড়িয়ে যখন দেখলাম পশ্চিমাকাশ লাল বধূ হ'তে শুরু করেছে তখনি ওখান থেকে তোর দাদুকে, তোর চাচীকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। এসে দেখি তোর বাবা তখনো রীতিমতো নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। আমরা এসে দাঁড়াতেও পারিনি। এমনি সময় তুই এলি হন্তদন্ত হয়ে। এক্কেবারে ঝড় তুলে।

এসেই তোর বাবার ঘুমন্ত শরীরে এক ধাক্কা মারলি। সেই ধাক্কায় তোর বাবা আচম্বিত উঠে একেবারে বসে পড়লো। লাল লাল চোখ তোর বাবার। এরই মাঝে তুই বললি,

ঘুমাচ্ছো কেন? গোধূলি লগ্ন যে চলে যাচ্ছে। রাখালেরা সব গরুর পাল নিয়ে ঘরমুখো হয়ে গেছে। ধোঁয়াটে হয়ে গেছে চারপাশ। জলদি চল।

তোর বাবা ঠাস্ করে তোর গালে এক চড় বসিয়ে দিলেন। আর সাথে সাথেই আবহাওয়া গেল এক্কেবারে পাল্টে। তোর দাদা দাদু তোর বাবার উপর বকুনির ঝড় বইয়ে দিলেন। তোর কান্না থামছে না। শেষে তোর দাদা তোকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। সেদিন তারপর তোর আর গোধূলি লগ্ন দেখা হয়েছিল কিনা জানিনা, তবে গুমোট আবহাওয়া আর স্বাভাবিক হলো না। তুই ভাত খেলিনা রাতেও। এরপর তোর বাবাও নরম হয়ে গেল খুব। কিন্তু তোকে আর স্বাভাবিক করা গেল না। তোকে অনেক আদর করলো তোর বাবা। সবাই। কিন্তু সেই যে অফ হলি তুই আর অন হলি না। পরদিন খুব ভোরে উঠেই আমরা চলে এলাম ঢাকায়।

আজ এই গোধূলি লগনের সামনে বসে সেদিনের সেই স্মৃতিগুলো এমন স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠছে চোখের সামনে। মনে হচ্ছে স্মৃতি নয়, আমি তুই তোর বাবা যেন এখনি ফিরে এলাম সেই ঝুরনিকান্দা অজপাড়া গ্রাম থেকে। যেখানে তোর দাদুর বাড়ি।

বেলা অনেক গড়িয়ে গেল। এখন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা। গোধূলি লগনে যখন শূন্য বাড়িটা ঘুরে গিয়ে বসলাম দোলনায়, মৃদু-মন্দ বাতাসের ঢেউয়ে যখন আপনা থেকেই হালকা দোল খাচ্ছিলাম, চোখ বুজে ভাবছিলাম জীবনের পাওয়া না পাওয়ার অসমাপ্ত অধ্যায়, এরই মাঝে কখন যে চোখ খুলে তার দৃষ্টি চলে গেল পশ্চিমাকাশে। আর সেদিকে তাকিয়েই বুকের ভেতরটা কেমন জানি হু হু করে উঠল তোর জন্য। মনটাকে কিছুতেই নিজের মাঝে ধরে রাখতে পারলাম না। উঠে গিয়ে বেডরুম থেকে কাগজ কলম এনে আবার গিয়ে বসলাম দোলনায়। ওখানে বসেই চিঠিটা শুরু করেছিলাম। এরই মাঝে গোধূলি লগ্ন কেটে সন্ধ্যা নেমে এল। তখন উঠে এলাম কাগজ কলম সহ। নামাজ পড়লাম। তজবিহ্ জপ করলাম। তারপর আবার বসলাম চিঠিটা নিয়ে।

এখন সন্ধ্যাও প্রায় শেষ হয়ে এল। বাইরে রাতের ইমেজ। খোকা, তুই কি করছিস্ রে এখন? বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে তোকে। ছোট্টবেলাটির মতো তোর মুখে ভাতের লোকমা তুলে দিতে ইচ্ছে করছে। বহুদিন থেকেইতো একাই আছি। কিন্তু আজ যে বড় বেশি নিঃসঙ্গ লাগছে। ঐ গোধূলির আকাশটাই কি আমাকে আজ এমন

ছন্নছাড়া উদাস করে তুলল কিনা বুঝতে পারছিনা। তোর বাবা নেই আজ বত্রিশটা বছর হয়ে গেল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ওরা তোর বাবাকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে গেল। সেই যে গেল আজও ফিরে এলো না। তুই তখন সবেমাত্র ক্লাশ নাইনে পরিস্। তারপর আজ এতটা বছর। তোকে মানুষ করার অঙ্গিকার নিলাম। সফল হয়েছি রে খোকা? জীবনের উপর দিয়ে কত যে ঝড় বয়ে গেল। তারপরও শক্তহাতে এই ছোট্ট বুকটার মাঝে চেপে ধরে আগলে রেখেছি তোকে।

খোকা, আজ আমার এমন লাগছে কেন রে? মনে হচ্ছে কতদিন, কতযুগ ধরে যেন কাঁদিনা। তুই ছোট বেলায় কাঁদলে আমি যেমন করে তোকে বুকে জড়িয়ে ধরে তোর কান্না থামাতাম, আমারও আজ খুব, খু-ব, খু-উ-ব ইচ্ছে করছে আমি কাঁদি, অঝোর ধারায় কাঁদি। আর তুই ঠিক তেমনি করে আমাকে তোর বুকে জড়িয়ে ধরে আমার কান্না থামিয়ে দে। তূর্য রে। বাপ আমার। আমার জীবনের অনেক ত্যাগের পরিণাম তুই। কোনদিন কোন মুহুর্তেও ভুল করেও তুই কখনো আমার সেই ত্যাগকে অসম্মান করিসনে রে খোকা। আমি, তোর বাবা, তোর জন্মের পর পুরু একটি বছর তোর নাম খুঁজে বেড়িয়েছি। সেই এক বছর তোকে আমরা খোকা বলেই ডাকতাম। তারপর অনেক খুঁজে খুঁজে তোর নাম রেখেছি তূর্য। তুই কি তোর নামের অর্থ জানিস খোকা? তূর্য মানে কি জানিস? তূর্য হচ্ছে প্রাচীন রণবাদ্য। শুধু একটা কথা মনে রাখিস, আধুনিক শিক্ষা কিংবা আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে যতই ঐশ্বর্য দিয়ে থাক না কেন প্রাচীনত্বের হাত ধরেই তা এসেছে, আসবে। কাজেই নতুনকে পেয়ে পুরাতনকে, পুরাতনের প্রচীনত্বকে মুছে ফেলিস না যেন।

তোর শুনে খুব মন খারাপ হবে হয়ত, আমাদের সেই খুশির মা আজ দুপুরে মারা গেছে। তোর বড় হওয়ার পেছনে খুশির মার খুব অবদান রয়েছে। তোর মনে আছে কিনা জানিনা, তোর বাবা নিখোঁজ হওয়ার পর ছ'মাসের মতো আমরা ইউনিভার্সিটির কোয়ার্টারে ছিলাম। স্বাধীনতার পর স্বাধীন দেশের সরকার অসহায় এই আমাকে আর তোকে করুণার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। আত্মসম্মানে লেগেছিল খুব আমার। জানিনা কেন। কেন জানি মনে হচ্ছিল এ দান নিলে তোর বাবাকে অসম্মান করা হবে। আল্লাহর উপর ভরসা করে তোকে নিয়ে খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ালাম। অবশ্য তোর দাদুর বাড়ি চলে গেলেও পারতাম। তোর চাচা, দাদা, দাদু ওরা যে কেউ চায়নি তা নয়। তবু গেলাম না আমি। আসলে ওখানে গিয়ে হয়ত আমি মানিয়ে নিতে পারতাম কিন্তু তোকে মানুষ করার অঙ্গীকার কিভাবে পুরণ করতাম আমি। আমাকে ভুল বুঝিসনে যেন বাবা।

আমি ছোটবেলা থেকেই বেড়ে উঠেছি শহরে। মরুভূমির গাছকে যদি সবুজ ঘেরা পৃথিবীর মাটিতে এনে লাগিয়ে দিস তাহলে সে কি তার প্রাণ ধরে রাখতে পারবে? কিংবা সবুজ ঘেরা পৃথিবীর মাটি থেকে যদি কোন গাছ তুলে নিয়ে মরুভূমিতে

লাগিয়ে দিস তাহলে সেটাই বা কি তার প্রাণ নিয়ে বেড়ে উঠতে পারবে? পারবে নারে খোকা। মাঝখান থেকে শুধু শুধু দোষ হয় গাছ বেচারার। আমিও পারলাম না। অবশ্য কিছুদিনও যে তোর দাদুর বাড়ি ছিলাম না তা নয়। বছর খানেকেরও বেশি ছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম আমার প্রাণ তখন কেবলি শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্য আকুলি বিকুলি করতো। শেষে একদিন তোকে নিয়ে বের হয়েই পড়লাম। তোর বাবার পরিচয়ে ইউনিভার্সিটির প্রায় সব শিক্ষকের সাথেই আমার ভাল পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। তাদেরই একজনের কাছ থেকে একটা রুম চেয়ে নিয়েছিলাম। কয়েকজন শিক্ষকের চার-পাঁচটা ছেলে মেয়েকে পড়ান শুরু করলাম। আর সাথে সাথে শুরু করেছিলাম তোকে মানুষ করার অক্লান্ত চেষ্টা। সেই বাসাতেই একদিন খুশির মা এলো। কাজের খোঁজে। পরপর চার পাঁচদিন এলো। জীবনের কষ্টের উপাখ্যান শোনাল। স্বামী তার একটি মাত্র মেয়ে খুশিকে রেখে ওকে বের করে দিয়েছে বাড়ি থেকে। বিয়েও করেছে। তবে তালাক দেয়নি খুশির মাকে। দেনমোহরের অংকটা নাকি ওর স্বামীর নাগালের বাইরে ছিল।

শেষে রেখে দিয়েছিলাম আমি খুশির মাকে। সেই থেকে সে আমাদেরই কাছে। আমি তুই আর খুশির মা। সপ্তাহ খানেক আগে খুশির মা ওর স্বামীর বাড়ি গিয়েছিল। খুশির খবর জানতে। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে হয়তবা পৃথিবীতে তাকে ধরে রাখার একমাত্র বৈঠাটিকে দেখার জন্য মন ছটফট করে উঠেছিল। আমিও মানা করিনি। মেয়ের জন্য বেচারী চারটা শাড়ী কিনে নিয়ে গিয়েছিল। সেই যে গেছে তারপর আজ দুপুরে একজন লোক কোথা থেকে ফোন করে জানাল খুশির মা মারা গেছে। স্বাভাবিক এই খবরটা শোনার পরও মনের কোথায় যেন চিনচিন করে একটা অস্বাভাবিক প্রশ্ন খেলে গেল, খুশির মা কি সত্যিই মারা গেছে! নাকি অন্য কিছু।

যাক ওসব। সংবাদটা শোনার পর থেকেই মনটা বিষণ্নতায় ছেয়ে আছে। কেবলি থেকে থেকে তোকে মনে পড়ছে। বৌমাকে মনে পড়ছে। টুসি দাদুমনিকে মনে পড়ছে। আমারতো এই সংসারে একেবারে নিজের বলতে আর কেউ নেই রে। অনেক কষ্ট করে যে আমি গড়েছি তোকে। তোকে ডাক্তার বানিয়েছি।

আর তুইওতো আমার চেয়ে কম যাসনে। এক্কেবারে মা কা বেটা। আমার এতটুকু কষ্টের অবকাশ রাখছিস না। ধানমণ্ডিতে বাড়ি করে দিয়েছিস। প্রতি মাসে টাকা পাঠাচ্ছিস। প্রায় প্রতিদিন ফোন করছিস। প্রতিবছরই দেশে এসে বাড়িঘর পরিষ্কার করে দিয়ে যাচ্ছিস। বাকী থাকলো শুধু আমার একাকীত্বটুকু। সে আমি মেনে নিয়েছি খোকা। আমরা জীবনে পেট পুরে না খাওয়ার কষ্ট অনেক করেছি। এখন পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে থেকেও যদি পেট পুরে খেতে পাওয়া যায় তাতে অন্তত

আমার কোন মন খারাপের কিছু নেই। তাছাড়া আমরাতো সবাই একই পৃথিবীর অধিবাসী।

আজ যে আমার কি হয়েছে রে খোকা। বুঝতে পারছিনা। মনটা ভীষণ এলোমেলো। গতবার ঢাকায় এসে গেটের দু'পাশে যে দুটো মুছান্দা আর রঙ্গন ফুলের চারা লাগিয়ে গেছিস মনে আছে তোর? সে গাছ দুটো বেশ ঝাকড়া হয়ে উঠেছে এখন। আজ সকালবেলা সবগুলো গাছের পরিচর্যা করলাম একটু। বারান্দার টবের গোলাপ গাছগুলোতে বেশ কটা গোলাপ ফুটেছে। সাদা গোলাপ ফুটেছে চারটি, গোলাপী তিনটি আর কাল একটি। সেদিকে তাকালে মন কেমন হয়ে যায়।
আজ যদি তোর বাবা বেঁচে থাকতেন কি যে খুশি হতেন। ঠিক এমন একটা স্বপ্নের কথা তিনি শোনাতেন আমাদের সবসময়। তোর বাবা কি জানে খোকা, তোর বাবার স্বপ্ন যে আজ আর স্বপ্ন নেই। একেবারে জলজ্যান্ত বাস্তব। তোর বাবাকে তোর কতটুকু মনে আছে খোকা? তুইতো তখন মাত্র নাইনে পড়তিস। আমার খুব ইচ্ছে ছিল তুই আর্টর্স নিয়ে পড়াশুনা করবি। সাহিত্যকে লালন করবি। কিন্তু তোর বাবার জন্য হলো না।

তোর বাবার সাফ কথা, সাহিত্য ব্যাপারটা পড়শুনা করে হয় না। ওটা অন্তরাত্মা থেকে আপনা থেকেই বের হয়ে আসে। অবশ্য যার আসে। আর যার না আসে ওটা কোন ভাবেই তার মাঝে আনা সম্ভব নয়। সাহিত্য ব্যাপারটা পুরুটাই আত্মিকতার সাথে জড়িত। গড গিফটেড আমরা যাকে বলি। ওটা যার ভেতরে বাস করে সে বিজ্ঞান পড়লেও বের হয়ে আসবে। আবার না থাকলে কলা নিয়ে পড়াশুনা করলেও আসবেনা। মানুষের অন্তরাত্মার সাথে এর সম্পর্ক।

তুই সাহিত্য-টাহিত্য কিছু পড়িসরে খোকা? নাকি মানুষের শরীর কাটাকুটি করতে করতে মনটাও ওরকম বানিয়ে ফেলেছিস। সাহিত্য পড়িস। যে মানুষ জীবনে একটিও সাহিত্য পাঠ করেনি সে মানুষের চেয়ে পঙ্গু জীবন বুঝি সত্যিকার পঙ্গুত্বের জীবনও নয়। সবচেয়ে বেশি পঙ্গু সে_তার নিজের মনের কাছে। তুইতো দেশে থাকতে যথেষ্টই সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিস। আমার রিডিং রুমে বই এর যে মস্তবড় সংগ্রহ রয়েছে সেখানেতো অনেক বই-ই তোর কেনা। পেট ভরে ভাত খেতে, মাকে খাওয়াতে আমেরিকা গিয়েছিস। ওখানকার তোর মনের কাছাকাছি তো আমি নেই। সাহিত্যটা ছেড়ে দিস না বাবা। তাহলে যে পাথরের সাথে তোর মনের কোন পার্থক্য থাকবে না আর। পেটের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে মনকে মরুভূমি করে ফেলিস না। বিশ্বের যত বড় বড় লেখক রয়েছেন তার বেশির ভাগটাই কিন্তু জন্মেছে তুই এখন যেখানে রয়েছিস সেখানে।

রাত অনেক হয়ে এল। বারটা বেজে দশ মিনিট হয়ে সাত সেকেন্ড পার হচ্ছে। ঘুমুচ্ছিস রে তূর্য। আমার ঘুম আসছে না। তোকে লিখতে লিখতে আজ রাতের খাবারও খাওয়া হয়নি। আজ আর খাবনা। এত রাতে খেলে হজম হতে সমস্যা হয় বড্ড। টুসিটা কি ঘুমিয়ে পড়েছে এখন? কতদিন যে তোর ঘুমন্ত মুখটাকে দেখিনারে খোকা। ঘুমিয়ে পড়লে তোর মুখটা কি সেই আগের মতই থাকে? বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। তুইতো বিদেশ যাওয়ার আগের দিনও ঘুমুতে যাওয়ার আগে আমার মুখ না দেখে ঘুমুতে পারিসনি। এখন কি করিস রে খোকা? আর ছোট্টবেলায় তুই যতক্ষণ না ঘুমাতি ততক্ষণ আমাকে তোর মুখের দিকে পলকহীন ভাবে তাকিয়ে থাকতে হতো। হঠাৎ তুই চোখ খুলে যদি দেখতে পেতিস কখনো, আমি চোখ বুঁজে আছি কিংবা অন্যদিকে তাকিয়ে আছি তাহলেতো আর রক্ষে ছিল না। একেবারে চিৎকার করে কেঁদে কি কাণ্ডটাই না বাঁধিয়ে ফেলতিস।

সেই খোকা আজ আমার তার খুকির বাবা।

তোর ঘুমন্ত মুখটা আজ খুব, খু-ব দেখতে ইচ্ছে করছে রে খোকা। জানিস, আজ সকালে দাড়োয়ানকে দিয়ে ছোট মাছ আনিয়েছিলাম। আমি নিজেই রান্না করেছি। দুপুরবেলা যখন খেতে বসেছি কেন যে খেতে পারলাম না জানিনা। তুই খুব পছন্দ করতিস ছোট মাছ। যেদিন টেবিলে ছোট মাছ থাকতো সেদিন ভাত কম পড়তো। বেশি ভাত খেতিস সে বেলা তুই। ওখানে কি ছোট মাছ পাওয়া যায় রে খোকা? বৌমাকে বলিস তোকে ছোট মাছের ঝোল করে দিতে।

তূর্য। আমার তূর্য। আমার বড় আদরের তূর্য। আমি পৃথিবীতে হয়ত অনেক ব্যাপারেই সার্থক নারী হতে পারিনি। কারণ, একজন মানুষের পক্ষে জীবনের চারদিকেই সার্থক হয়ে উঠা সম্ভব নয়। মানুষকে সে সুযোগ বিধাতাই দেননি। তবে আমি সার্থক মা হয়েছি। আমার যে আজ কেনো এমন অগোছালো লাগছে আমি বুঝতে পারছিনা। গোধূলি লগনের সেই লাল শাড়ি পড়া আকাশটাই আজ আমাকে আমার ভেতর থেকে বের করে এনেছে। আমার মনটাকে ভীষণ এলোমেলো করে রেখে গেছে। ভাবছি কটাদিন তোমার দাদুর বাড়ি গিয়ে থাকবো। সেই ঝুরনিকান্দা গ্রামে। কিন্তু গ্রাম হয়তো এখন ঠিকই আছে, শুধু বদলে গেছে শহরের মতো গোধূলি লগন। রাখাল, রাখালের মন উদাস করা বাঁশীর সুর, গরুর পাল, গোধূলি লগনে ঘরমুখো গরুর পালের খুরের আঘাতে ধুলা উড়ে চারপাশ ধোঁয়াটে হয়ে যাওয়া, আঁকাবাঁকা পথ কিছুই হয়তো এখন আর নেই। হয়তো নেই সারা গ্রাম জুড়ে তোমার বাবার মতো মাত্র একজন শিক্ষিত মানুষ। তবু যাব। শুধু যাব সেখানে তোমার বাবা ছিল। এইজন্য। তোমার শেকড়ও যে সেই ঝুরনিকান্দা গ্রামেই। শুধু এইজন্য যাবো।

তুমি ভাল থেকো বাবা। খুব, খু-ব, খু-উ-ব ভাল থেকো। টুসি দাদুমনিকে আমার আদর দিও আবারও। বৌমার প্রতি যত্ন নিও। বৌমাকে কখনো অবহেলা করোনা। কষ্ট দিও না। মনে রেখো, জীবনের দ্বিতীয় ভাগে একজন পুরুষকে কিন্তু কিছুই ছাড় দিতে হয় না। আর একজন নারীকে তার জীবনের প্রথম ভাগকে এক রকম ভুলে যাওয়ার অঙ্গীকার করতে হয়। শুধু সেখানেই শেষ নয়, স্বামীর সব কিছুকে সে যদি স্বামীর পছন্দ অনুযায়ী মেনে নিতে না পারে তাহলেই ওর হয় হার। জীবনের কাছে চরম পর্যায়ের এক হার। যা তাকে তার সামাজিক অবস্থান থেকেও বিচ্যুত করতে পিছ পা হয় না। অবশ্য এ রীতি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার জন্য। আমি চাই আমি যেমন একজন সার্থক মা হয়েছি, তুমি হয়েছো সার্থক সন্তান, ঠিক তেমনি তুমিও হবে একজন সার্থক স্বামী, সার্থক বাবা।

বৌমাকে আমার দোয়া রইল। বৌমা আমার খুব লক্ষ্মী মেয়ে।

রাত সাড়ে বারটা পার হয়ে গেলরে খোকা। আমার জন্য মোটেও দুশ্চিন্তা করিস না যেন। ঐ গোধূলি লগনটাই যত্তোসব গোলমাল বাধালো। নইলে কি সকাল ছ'টায় পুরো একঘন্টা পাঁচ মিনিট আমার খোকার সাথে গল্প করার পর গোধূলি লগনের সাড়ে ছ'টা না বাজতেই তোর কাছে আবার হৃদয়ের ঝাপি খুলে বসি। পাগলিনী মা তোর। ভাল থাকিস্ খোকা। আবারও-

আমার স্নেহাশীষ নিস্।
আমার ভালবাসা নিস্ ।
আমার অনেক অনেক আদর নিস্।

তোর মা।

মোঃ শহিদুল ইসলাম*

কনসার্ট

দেহটা ক্লান্ত হয়ে পড়লেও হৃদয়ের মধ্যে যে বরফের পাহার বেঁধেছিল সেটাকে গলিয়ে নিয়ে এলাম।

বেশ ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু মনে যেন আনন্দের জোয়ার বয়ে চলছে। তা না হলে এ ক্লান্ত শরীরে কেন নাচের ঝুমকা বেজে উঠবে। দেহের সাথে মনের একটা সম্পর্ক থাকে। দেহ ক্লান্ত থাকলে মনের স্বাদও কমে আসে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ঘটেছে উল্টো। দেহটা ক্লান্ত বটে কিন্তু মনটা চাঙে উঠে বসে আছে।

আসলে মনটা আমার অবাধ্য। কোন কথা শোনে না। কথা শুনলে হয়ত চাঙে না রেখে মেঝেতেই রাখতাম। চাঙে উঠে সে যেন লাফাতে শুরু করেছে। থামানোর কায়দা পাচ্ছি না। তাই অপারগ হয়ে ছেড়ে দিয়েছি। নেচে মরুক। গতকালও মনটা বিষণ্ন ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে সে হয়ে উঠেছে দুরন্ত অশ্বের মতো। থাক সে কথা। মনটাকে মুক্ত ভাবে ছুটতে দেখেছি। তাই ধন্য।

গতকাল দিনের শেষে আড্ডা দিচ্ছিলাম বন্ধু মহলে। অনেক আলাপের মধ্যে হঠাৎ কেউ মাঝখান থেকে বলে উঠল, আগামীকালের কনসার্টটা বেশ জমে উঠবে। কনসার্টের কথা আমাদের জ্ঞাত ছিল। তাই অনেকে বলে উঠল, কনসার্টের কথা বলতে হয় নাকি। ওটা ক'জনে মিস করে। তার মধ্যে আবার নগর বাউল।

এতক্ষণ চুপ করেই ছিলাম। কিন্তু কথাটা শোনার পর মনে যেন বসন্ত বয়ে এল। তাই বলে উঠলাম, তোরা সবাই যাবি? একসাথে অনেকে বলে উঠল – যাবো না মানে!

আমি আবার চুপ করে বসে রইলাম। ওরা যাবার সময় নির্ধারণ করল। আমার বোধহয় যাওয়া হবে না। নগর বাউল যে আমার প্রিয় নয় তা নয়। পরশু টিউটোরিয়াল থাকায় আমার যাওয়া হচ্ছে না। তাই মনের কাটাটা আঘাত করলেও সহ্য করছিলাম। চারদিকে অন্ধকার হয়ে আসছিল। কাজেই আলোচনার সমাপ্তি

*শিক্ষার্থী, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

ঘটিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। কিন্তু কনসার্টের চিন্তা এখনও মাথা থেকে যায়নি।

এতক্ষণ যেটা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেছি সেই চিন্তাই যেন মনের জায়গা দখল করে নিল। শত চেষ্টা করেও তা ঘোরাতে পারলাম না। প্রশ্ন করে উঠল, "তুমি যাবে না কেন? নগর বাউল আসবে। তাকে তো একবার দেখতে যাবে।" আমি মনের বিরুদ্ধে চলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু বার বার সেই-ই জয়ী হয়ে উঠছে। সে কত কি ভাবছে। কাল কনসার্টে যাবে, গান শুনবে। এমনি করে বাড়ি ফিরে এলাম।

বিলম্ব না করে পড়ার টেবিলে বসলাম। ইতিমধ্যে পড়াও শুরু করলাম। কিন্তু কখন যেন অবাধ্য মন পড়ার গণ্ডি পেরিয়ে চলে গেছে কনসার্টে। মনকে বেঁধে রাখতে পারলাম না। যদি বাধা যেত তাহলে বড় একটা তালা ঝুলিয়ে বন্দি করে রাখতাম।

কিন্তু তা সম্ভব নয়। সে চলে তারই ইচ্ছা মতো। চলে যায় তাজমহলে, কখনো নদীর ধারে। আবার কখনো সুন্দর বনের রয়েল বেঙ্গলের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। তাই সে নিজেই একটা কনসার্ট তৈরী করে গান শুনছে। সে গানের গায়ক জেমস্।

কনসার্টের শেষের দিকে একটা গানের কলি টান দেওয়ার সময় আমার মনও সুর মেলাতে গিয়েছিল তার সাথে। সেই টানই যে তার শেষ টান হবে তা কে জানতো। টানের সাথে বসে থাকা চেয়ারটাও উল্টে পড়েছিল পেছন দিকে। আমি তখন টের পেলাম যখন চেয়ার সমেত মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। বুঝলাম,মন আমার সাথে রসিকতা করল।

বেশ রেগে পড়তে শুরু করলাম। পরশু আমার পরীক্ষা। সন্ধ্যা থেকে রাত বারটা পর্যন্ত যা পড়লাম তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে শূন্য।

বাঙালী হয়ে বিদেশী গানের প্রতি এত ঝোঁক। কনসার্টেতো একটাও বাঙালী অনুকরণে গান গাওয়া হয় না। যদি হতো তাহলে বিদেশী মিউজিকে গড়া গানের দিকে কান যেত না। আমরা আধুনিক হতে যেয়ে গিটার হাতে নিয়ে বিদেশীদের মতো বাজাতে পারি বটে কিন্তু সেই মিউজিকে নিজের দেশের গানের সুর তাল মিলাতে না পেরে হয়ে যাচ্ছে বিকৃত। ফলে আমাদের গানের সুর হারাচ্ছে নিজস্বতা। হারমোনিয়াম,তবলা, একতারা আজ ব্যাকডেটেড। এ রকম আরো অনেক কথাই নিজের মনকে শুনালাম।

তারপর অনেকক্ষণ ভেবে বললাম, এ জন্য তো নগর বাউল বা অন্য কোন ব্যাণ্ড শিল্পী দায়ী নয়। দায়ী আমাদের রুচি। বাঙালী হয়েও আমাদের রুচিবোধ বিদেশী। বিদেশীদের অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে ঠেলে দিচ্ছি রসাতলে। বিদেশীদের চুল কালো করার তেল আমরা চুলের সাথে শরীরেও মাখি। ফলে চুলের সাথে আমাদের শরীরটাও হয়ে যায় কালো।

অনেক রাত হলো। চারদিক নিস্তব্ধ। চোখের পাতাও ঘুমে বন্ধ হয়ে আসছে। কাজেই ওসব চিন্তা বাদ দিয়ে বালিশে মাথা রাখলাম।

খানিক বাদেই হারিয়ে গেলাম ঘুমের দেশে।

হিরন্ময় হিমাংশু[*]

সেদিন আকাশ মেঘলা ছিল

শরীরটা একটু মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে অসার হয়ে পড়ে থাকা হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হতে হতে চোখের পাতা কাঁপতে থাকে শিমুনার। পাশে দাঁড়িয়ে ডা. মিত্র আর সহকারী নার্সটি প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে শিমুনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। শিমুনার চোখের পাতা কাঁপতে কাঁপতে সামান্য ফাঁক হয়। ডা. মিত্র'র সাদা পোশাক শিমুনার চোখে পুরোপুরি ভাসতে না ভাসতে আবার তার চোখ বুজে আসে । সাদা হাল্কা লালের সাথে মিশাল হয়ে আকাশের নীল আর কালো মেঘের মিশ্রণ স্মৃতিপটে হজবরল হিজিবিজি কাটে অনেকক্ষণ। অতঃপর মুষ্ঠিবদ্ধ হাত মেলান হয় শিমুনার। ডা. মিত্র একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওসিসি ওয়ার্ডের বাইরে বেরিয়ে আসে। রামিজ আর তার স্ত্রী প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে ডাক্তারের মুখোমুখি হয়। জিজ্ঞাসা করে, স্যার আমার -। কথা মুখেই থেকে যায় ওদের। জবাবে ডা. মিত্র 'জ্ঞান ফিরেছে তবে এখনো আশঙ্কা মুক্ত নয়' বলেই তার অফিস রম্নমে ঢুকে যায়। উদ্বিগ্ন পিতা-মাতা শিমুনার রুমে যায়। ততক্ষণে নার্স ঘুমের ইনজেক্শন দিয়ে আবার ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে শিমুনাকে। শিমুনার নিস্তেজ দেহটা হাসপাতালের বেডে বাবা-মা সনাক্ত করে। স্নেহের সন্তানকে তারা জড়িয়ে ধরতে চায়। নার্স বাধা দিয়ে বলে- এখন কান্নাকাটির সময় নয়, বাইরে যান প্লীজ। সন্তানের কল্যাণার্থে তারা সংযত হয়ে বেরিয়ে আসে ওসিসি ওয়ার্ড থেকে।

জ্ঞান ফিরেছে ঠিকই কিন্তু ডাক্তারের কথায় যা বুঝা গেল এখনো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি শিমুনা। তাহলে কি মেয়েটা - - আর ভাবতে পারেনা তারা। শুধু শিমুনার অতীতের দিকে তাকিয়ে অনুশোচনায় বুক ভরে যন্ত্রণা অনুভব করে। হয়তো মেয়েটা আর কখনোই স্বাভাবিক হবেনা। আর হলেও কি ও স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকতে পারবে? চলতে পারবে সমাজে আর দশটা সাধারণ মেয়ের মত? ও হয়তো চেষ্টা করবে কিন্তু সমাজ মানবে না। এই অনিয়মের সমাজটা কখনোই মানেনা, মানেনা মনুষ্যত্ববোধের স্বাভাবিক নীতিগুলো। দ্রব্যমূল্যের পঙ্খিরাজে চাপা দেশের মধ্যবিত্তের যন্ত্রণায় বেড়ে উঠা শিমুনার একটা ছোট্ট আশা ছিল, ও নার্স

---

[*] শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

হবে। আর্তপীড়িত মানুষের সেবা করতে করতে উদ্দেশ্যহীন নিরর্থক জগতে বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজবে। অনিশ্চয়তার জ্বলন্ত সমকালে আশাটা জ্বলতে থাকে রামিজের হৃদপিন্ডে। কারণ মেয়ের আশাটা হৃদয়ে পুরে অর্থবোধক করে তুলেছিল সে। এ মুহূর্তে এই যন্ত্রণা তাকে বেশি পোড়ায়। একটা একান্ত আশা যখন সমকালের বন্ধুর পথে হোঁচট খায় তখন উদ্দেশ্যহীন যন্ত্রণায় ও জ্বলতে থাকে। রামিজ ভাবতে ভাবতে ভাবনা সাগরের তল খুঁজে ফিরে। কিন্তু পায়না, যেমন ও পায়না নিঃস্পাপ মেয়েটার এই পরিণতির কারণ। মেয়েটা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। কোথাও থেকে বাড়িতে এলেই গলা জড়িয়ে ধরে বলত- আমার সোনা বাবা কোথায় ছিলে এতক্ষণ।

রামিজ কোলে নিয়ে বলত লক্ষ্মী মা আমার, এই তো তোমার পাশে আছি। বাবা-মেয়ের মধ্যে ভালবাসা ছিল অত্যন্ত নিখুঁত। মাঝে মাঝে শিমুনার মা বিরক্ত হয়ে বলতো আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে মাথায় তুলছ। এর ফল ভাল হবে না কিন্তু।

এইতো গত বছরের ঘটনা। শিমুনাকে না জানিয়ে ও এক আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে যায় দু'দিনের জন্য। সে দু'দিনই শিমুনা পানি ছাড়া কিছুই মুখে দেয়নি। তার মায়ের শত অনুনয় বিনয় কোন কাজে আসেনি। শুধু একটাই অভিযোগ, বাবা কেন তাকে বলে গেলনা? অবশেষে লোক পাঠিয়ে রামিজকে নিয়ে আসা হয় এবং রামিজ নিজের হাতে শিমুনার মুখে ভাত দিয়ে অনশন ভঙ্গ করে। অতঃপর বাবাকে জড়িয়ে ধরে কি যে কান্না শিমুনার!

আজ শিমুনার শরীরটা নিথর হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। একটু স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারছে না সে। বুকটা তার মোচড় দিয়ে ওঠে, হাহাকার করে ওঠে। মেয়েটা বেঁচে আছে তারপরও কি যেন হারানোর যন্ত্রণায় তার মন বিষণ্ণতায় ভরে থাকে সারাক্ষণ। সেই নরপশুদের প্রতি তীব্র ক্ষোভে ও জ্বলতে থাকে। যারা তাঁর আদরের মেয়েটার সব কিছু কেড়ে নিল, যারা তার আশার ছেদ টানল। তার তীব্র ক্ষোভ হয় সেই সাংবাদিকদের উপর যারা ঘটনাটা বুঝে উঠার আগেই বস্তাপচাঁ খবরের কাগজগুলোকে সংক্রমিত করল। যারা নাম ধাম বিবরণ ছেপে দিল। তাদের ব্যবসা বাড়ানোর জন্য মেয়েটার ভবিষ্যৎ নষ্ট করল।। খবরের কাগজগুলো মনে করল সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্বপালন করল। কিন্তু দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে কি যে তারা সর্বনাশ করল তা বুঝেও বুঝলনা। তারা মেয়েটাকে বাঁচিয়ে ঘটনাটা প্রকাশ করতে পারতো। অন্যভাবে। কিন্তু তা না করে তারাও নরপশুদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। মেয়েটার ভবিষ্যৎ গায়ে মেখে চার-পাঁচ দিন ধরে ওরা হৃষ্ট-পুষ্ট হল। আমরা যতই নিজেকে সভ্য বলে দাবি করিনা কেন, আসলে সভ্যতার কোন ছোঁয়াই আমাদের স্পর্শ করেনি। পারবে আমাদের সভ্য পরিবারের কেউ মেয়েটাকে মেনে নিতে? জানি তাতে খটকা বাঁধবে মনে, পরিবারে, সমাজে। কিন্তু আমাদের খটকা

বাঁধেনা অযৌক্তিক ভুল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যখন সমাজপতিরা বিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে। কি সহজেই আমরা মেনে নিই নির্বোধের মতো।

এমন সময় নার্স ওসিসি ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে দ্রুত অফিসের দিকে গেলে রামিজের ভাবনায় ছেদ পরে। কিছু বুঝে উঠার আগেই ডাক্তারকে নিয়ে নার্স ওসিসি ওয়ার্ডে ঢুকে। রামিজ আর শায়লা উৎকণ্ঠা নিয়ে রুমের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাদের মনে শত অজানা আশঙ্কা ভর করে।

ভিতরে ডা. মিত্র তন্ন তন্ন করে নিরীক্ষণ করে শিমুনার আপাদমস্তক। চোখের পাতা একটু একটু করে মৃদু কাঁপতে থাকে শিমুনার। ডা. মিত্র ঝুকে আসে শিমুনার মুখের কাছে। একটু পর চোখের পাতা খুলে আসে শিমুনার। প্রথমেই ডাক্তারকে দেখে মনে হোঁচট লাগেওর। তারপর নিজেকে সামলে নিতে গিয়েই সর্বশরীরে তীব্র ব্যথা অনুভব করে। অতঃপর গত রাতের বিভৎস টানাহেঁচরা স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে, হাউমাউ করে কেঁদে উঠে শিমুনা।

ডা. মিত্র নার্সকে সামলাতে বলে বেরিয়ে আসে রুম থেকে। মুখে প্রশান্তির ছোঁয়া। রামিজ একটু এগিয়ে এসে তার মুখোমুখি হতেই ডা. মিত্র বলল- জ্ঞান ফিরেছে। এখন আশঙ্কামুক্ত। দু-চার দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠবে। এখন আপনারা ভিতরে যেতে পারেন।

রামিজ শায়লা শিমুনার রুমে যায়। শিমুনার দৃষ্টি তখন উদাস। বোবা কান্নার মত বাঁধভাঙ্গা অশ্রু গড়িয়ে পরে দু'চোখ দিয়ে। ভিজতে থাকে বালিশ, বিছানা। শায়লা শিমুনার উপর হুমড়ি খেয়ে পরে যেতে চায় কিন্তু নার্স বাঁধা দিয়ে আগলে ধরে বলে- এখন কান্নাকাটির সময় নয়। কান্নাকাটি করলে বিপদ হতে পারে। ওর মনের অবস্থা বিশেষ ভাল না। পারলে ওকে শান্তনা দিন, ওকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করুন।

শায়লা নিজের আবেগকে বহু কষ্টে সংযত করে শিমুনার শিয়রে বসে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় মেয়ের। শিমুনার চোখের অশ্রু আরো বেগবান হয়। শায়লা স্বাভাবিক কণ্ঠে বহু কষ্টে বলতে থাকে- লক্ষি মা আমার, কেঁদোনা। কিচ্ছু হয়নি সোনা মা আমার। শিমুনা বহু কষ্টে হাত দুটো উপরে তুলে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে।

দৃশ্যটা রামিজকে পীড়িত করে, তার তীব্র ক্ষোভ যন্ত্রণাময় হয়। সে শিমুনার পায়ে হাত বুলাতে থাকে অতি সযত্নে। অজানা নরপশুদের মুখাকৃতি তার কল্পনায় ভেসে ওঠে গায়ে দ্বিগুণ বল অনুভব করে। ছিন্ন বিছিন্ন করে ফেলতে চায় তাদের।। গতরাতে অনেক খোঁজ খবর নিয়ে যখন শিমুনার সন্ধান মিলল বেড়িপাড়ার প্রাইমারি স্কুলের ভাঙ্গা রুমে, তখন শিমুনার নিথর কাটা ছেড়া দেহটাকে খুব সযত্নে তুলে

আনে হাসপাতালে সে। তখন থেকেই রামিজ কল্পনায় কল্পনায় কতবার হত্যা করেছে, কতবার রক্তাক্ত করেছে নরপশুদের, তার অন্ত নেই।

দিন সাতের মাথায় শিমুনা একটু সুস্থ একটু স্বাভাবিক হল। ওকে বাবা মা বাড়ি নিয়ে এল। পড়শিরা একে একে এসে দেখে যাচ্ছে। যে যেভাবে পারছে সহানুভূতি জানাচ্ছে। কেউ আবার অশ্লিল ভাষায় গালি গালাজ করছে তাদের, যারা শিমুনার এ অবস্থার জন্য দায়ী। কেউ তাদের কঠিন শাস্তি দাবি করছে, যেন জন্মের মত বাপের নাম ভুলে যায়। শিমুনা শুধু ফ্যালফ্যাল করে ওদের মুখের দিকে চায়, কষ্টে ওর বুক ফেটে যায়। নিজেকে সামাল দিতে বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ বুজে দেয়। অঝোর ধারায় কান্না আসে, ও নিজেকে সামলাতে পারেনা। ঘন ঘন হেঁচকি আসে। বালিশ ভিজে যায় তার, এক সময় ভেজা বালিশেই তন্দ্রা আসে।

সেদিন আকাশ মেঘলা ছিল। দুপুর থেকে বিকালের আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলে আকাশটা একটু ফর্সা হয়। শিমুনা তার ছোট ভাই সাজু আর চাচাতো ভাইয়ের ছেলে রবিকে নিয়ে ঘুরতে বের হয়।

ওরা হাঁটতে থাকে শেনুয়া নদীর ধার ঘেঁষে নরম ঘাসের উপর দিয়ে। সাজু ভাঙ্গা হাড়ির খলাগুলো কুড়ে নিয়ে পানির উপরে ঢিল মারে আর হাঁটতে থাকে। শিমুনা রবির হাত শক্ত করে সাজুর পাশে পাশে হাঁটতে থাকে। ওরা হাঁটতেই থাকে। কলাগাছগুলো পেরিয়ে মাকলা বাঁশ, জেওঠ্যা বাঁশ, বড়বাঁশের ঝাড়গুলো ডিঙিয়ে। আখ ক্ষেতের ধার ঘেঁষে নদীর ভাঙ্গা পাড়ের কিনারে কিনারে। শিমুনার মনে আসে বিভিন্ন গানের ভাঙ্গা ভাঙ্গা কলি। সেসব গুনগুনিয়ে ওঠে আবার নদীর মরা স্রোতে মিশে মরে যায় অকালে। ও গুনগুনাতে থাকে মনে মনে। চার বছরের রবি শুধু শিমুনার মুখের পানে তাকিয়ে হাঁটতে থাকে। ঢিল ছুড়ে দেখতে দেখতে সাজু পিছনে পড়ে যায়। শিমুনার ধমকি খেয়ে আবার দৌড় দেয় পিছু পিছু। শিমুনার গুনগুনানি থামে আবার শুরু হয়। নদীর পানির মৃদু টান দক্ষিণে নেমে যায় ধীরে ধীরে। ওরাও এগিয়ে যায় সময়ের সাথে পানির সাথে শেনুয়া নদীর কিনার ঘেঁষে ঘেঁষে। এক সময় পাকা রাস্তায় এসে উঠে। পিছনে বরুনাগাঁও মোড়, গোটা পঁচিশেক দোকান, আর কোয়ার্টার কিলোর মতো সামনে হাঁটলে কাজী পল্ট্রি ফার্ম। সাজু এরই মধ্যে বায়না ধরে বসেছে ও পল্ট্রি ফার্ম দেখবে। বলে, আপু চলনা ফার্মটা দেখে আসি। আজ কতদিন দেখিনা। শিমুনা আকাশের পানে তাকায়। মেঘলা আকাশ, বেলা বেশি নেই। তাছাড়া আষাঢ়ের আকাশকে বিশ্বাস করা যায় না। কবে কখন নেমে পরে তা বলা ভার। সে বলে, নারে আজ বেলা নেই। ফিরে চল। সাজু বলে- তাহলে তুই যা, আমি পরে যাব। শিমুনা বলে- অন্যদিন, আজকে ফিরে চল।

সাজু পূর্বের ভূমিকায় অটল থাকে। ওর আজকে ফার্ম দেখা চাই। শিমুনার মনটা কোমল হয়। ছোট ভাইএর আবদারটা ও পূরণ করতে চায়। ওরা হাঁটতে থাকে

ফার্মের অভিমুখে। ওরা হাঁটতে থাকে পাকা রাস্তার কিনার ধরে সারি সারি মেহগনি, শিশু, নিম গাছ এড়িয়ে। এগিয়ে যায় ফার্মের দিকে। আর কিছুদূর হাঁটলে রাস্তার বাঁক। বাঁকটাকে কেন্দ্র করে গোটা পাঁচেক দোকান আর একটু সামনে চার মিনিটের পথ। তারপর কাজী ফার্মের মেইন গেট।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে বাঁক পর্যন্ত এল। আকাশে তখন উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে ঘণকালো মেঘ তাবৎ আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। আর ভূ-পৃষ্টে নেমে আসছে দ্রুত অন্ধকার। যদিও সন্ধ্যা হতে তখনো অনেক বাকি। মানুষজন গন্তব্যে পৌঁছার জন্য ছুটাছুটি করছে। বাঁকটাকে অতিক্রম করে শিমুনারা ফার্মের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। এমন সময় 'মালটা যায় কোথায়' শব্দটি কানে এলে শিমুনা থমকে দাঁড়ায়। কথাটার উৎসের সন্ধানে ওর দৃষ্টি গিয়ে আঘাত হানলো পাশের দোকানে। কাঠের বেঞ্চে ছয়জন বখাটে ছেলে বসে নিকোটিন পুরাচ্ছে। ওর চোখ পরতেই ওরা মিটিমিটি হাসে। শিমুনার অনুমানটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাঁকি রইলনা যে, এদেরই কেউ বলেছে কথাটা। তাই তাদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল- কি বললি হারামজাদারা, তোদের মা- বোন নেই?
বখাটেদের একজন বলে- মাগি কারে কি কস, খবর কইরা দিমু কইলাম।
কি খবর করবি! হু! শয়তানের বাচ্চা শয়তান। বলে শিমুনা ওদের দিকে পায়ের জুতা উঁচিয়ে ধরে আবার বলে, পিটিয়ে চ্যাপটা করে দিব হারামির দল।

বখাটেরা নিশ্চুপ থাকে। রাস্তার লোকেরা মীমাংসা করে দেয়। শিমুনারা ফার্মের দিকে এগিয়ে যায়। গেটের দাঁড়ওয়ানের সাথে কথা বলে ভিতরে যায়। অতি উৎসাহে সাজু ফার্মের ভিতর ঘুরে দেখতে থাকে। আর অজানা আশংকায় শিমুনার মন ভরে থাকে। সাজু আর রবির নানা প্রশ্নের দায়সারা ভাবে হ্যাঁ আর না জবাব দেয় মাত্র। ফার্ম দেখা শেষ হলে ওরা গেটের বাইরে আসে। তখন সন্ধ্যা আসন্ন। মাথার উপর গম্ভির আকাশ। যে কোন মূহুর্তে নামতে পারে। ওরা আর সময় খরচ না করে দ্রুত হাঁটতে থাকে বাড়ির অভিমুখে। যে পথে আসছিল, রাস্তায় সেই বাঁকে বরাবর যেতে না যেতেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি নামতে শুরু করল। ততক্ষণে বাঁকের বাকি দোকানগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে। শুধুমাত্র বখাটেরা যে দোকানে বসে আছে সেই দোকানটা ছাড়া। আশে পাশে কোন বাড়ি-ঘর নেই।। তাই উপায় অন্তর না পেয়ে ওই দোকানেই আশ্রয় নেওয়ার জন্য ওরা ছুটে গেল। ভাবল, কিছুক্ষণের মধ্যেই বোধ হয় বৃষ্টি থেমে যাবে। কিন্তু মন্দ কপাল, বৃষ্টি আরো জোরে নামতে শুরু করল সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে। দোকানে বখাটে ছয়জন ছাড়াও আরো একজন পথচারি আছে। এরই মধ্যে বখাটেরা দু-একটা অশ্লিল ভাষা ছাড়তে শুরু করেছে। শিমুনা তার অন্তর্যামীর কাছে প্রার্থনা করে চলছে যেন বৃষ্টি থেমে যায়। কিন্তু প্রকৃতি যেন বিমুখ, ছাড়তে চায় না। এরই মধ্যে আশ্রিত পথচারীটি ভিজে ভিজে চলে গেছে।

সেও চলে যেতে পারত শুধু পারেনা সাজু আর রবির জন্য, বৃষ্টিতে ভিজলে ওদের শরীর খারাপ করতে পারে তাই। ততক্ষণে বখাটেরা আরো অশ্লিল শব্দ ছাড়ছে বেশি মাত্রায়। কিন্তু শিমুনার কিছু বলার নেই। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে ধরে রেখেছে।

একটা বখাটে ছেলে এসে সামনে দাঁড়ালো। শিমুনা ওর আপদমস্তক তাকাতে না তাকাতেই ছেলেটা জাপটে ধরল শিমুনাকে। শিমুনা প্রচন্ড শক্তি দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল দোকানের বাইরে তাকে। তারপর আরো দু'জন ছেলে এসে শিমুনাকে জাপটে ধরে জোর করে দোকানের ভিতরে নিয়ে গেল। দৃশ্যটি দেখে সাজু আর রবি কান্নাকাটি শুরু করল। ওদেরও দোকানের ভিতর নিয়ে গিয়ে দোকানের ঝাপ ফেলে দিয়ে আটকিয়ে দিল ওরা। দোকানের ভেতর প্রদীপের মৃদু আলোয় শিমুনা দেখতে পেল, দোকানের গোডাউনে সাজু আর রবিকে নিয়ে গিয়ে দরজা আটকে দিল ওরা। তখন তারা জোরে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। শিমুনা ওদের দিকে ছুটে যেতে চাইলে একজন ওকে জাপটে ধরে মেঝেতে ফেলে দিল। তারপর শুরু হল শিমুনাকে নিয়ে টানা হেঁচড়া। তার মনে হচ্ছিল দানব যেন তাকে খাবলে খাচ্ছে। সে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে বার বার ব্যর্থ হলো। একসময় জ্ঞানহীন নিথর হয়ে পড়ল তার শরীর। তারপর যখন জ্ঞান হল চারিদিকে অন্ধকার। অতঃপর অন্ধকার। কে যেন ওকে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর ওর মাথাটা ঝুকে আছে তার পিঠে দিকে। তারপর স্কুলের বারান্দায় এনে তার নিথর দেহটা নামালো। অতঃপর আবার অসহ্য যন্ত্রণা।

আবার মৃত্যুর যন্ত্রণা। আবার শিমুনার শরীর নিয়ে দানবের খেলা।
শিমুনার তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। সে হাঁপাতে থাকে একাকি বিছানায়।

এরই মধ্যে থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ প্রথম অভিযানেই দোকানদার সহ আরো একজনকে গ্রেফতার করেছে। এরপর দ্বিতীয় আর তৃতীয় অভিযানের ফল শূন্য। এর দু'দিন বাদেই অভিযুক্ত বাকি পাঁচজন আদালতে আত্মসর্মপণ করেছে। পাড়ায় বহু আলোচনা সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সবারই উক্তি এর একটা উপযুক্ত শাস্তি চাই, যেন আর এরকম ঘটনা না ঘটে। কারণ সবারই মা-বোন আছে। বহু প্রতীক্ষার পর একদিন আদালত বসল। এলাকার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আদালতে এলো। এদের মধ্যে কেউ কেউ সাক্ষ্য দেবে।

আসামী সাতজনকে কাঠগাড়ায় দাঁড় করানো হলো। আসামী–বাদী দু'পক্ষের লোক ছাড়াও সাংবাদিকও রয়েছে। শিমুনা মাথা নীচু করে এক কিনারে বসে আছে। আদালতের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে একজন আইনজীবি উঠে দাঁড়ালো এবং খুব বিনয়ের সাথে বলতে লাগল- মহামান্য আদালত, একটা নিরীহ অসহায় মেয়েকে

পেয়ে আসামী সাতজন তাকে ধর্ষণ করেছে। তার উপযুক্ত প্রমাণসহ এলাকাবাসী অনেকেই সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত রয়েছে। আর সাতজন ছেলেই এলাকায় বখাটে বলে পরিচিত। মহামান্য আদালত আমি সেই দুর্বিসহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে চাইনা। আমি চাই এমন শাস্তি হোক যেন আর সমাজে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। আমি এর যথাপোযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণসহ ....

কথা আর শেষ হতে দেয় না অন্য একজন আইনজীবি। এর প্রতিবাদ করে বলতে থাকে, মহামান্য আদালত, আমার প্রতিপক্ষ বন্ধু হয়তো ভুলে গেছেন, ঘটনা ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি এর যথোপযুক্ত প্রমাণসহ একটা নষ্ট মেয়ের চরিত্র আপনার সামনে তুলে ধরব। তার আগে আমি বাদিনীকে কিছু জেরা করার অনুমতি চাই।

এরই মধ্যে আদালতে একটা প্রচন্ড হট্টগোল শুরু হল। শিমুনাকে নষ্ট মেয়ে বলার জন্য এলাকার সবাই প্রতিবাদ জানাতে শুরু করল।

মহামান্য আদালত টেবিলে জোড়ে শব্দ করে সবাইকে নিরবতা পালন করার জন্য আদেশ দিলেন এবং বাদিনীকে জেরা করারও অনুমতি দিলেন।

শিমুনা এসে কাঠগড়ায় দাঁড়ালো। অতঃপর জেরার আগের অনুষ্ঠানিকতা সারা হলে বিজ্ঞ আইনজীবি জেরা করবার জন্য সামনে এসে দাঁড়ালো। শিমুনার কঠিন দৃষ্টি আইনজীবির রহস্যময় দৃষ্টিতে হোঁচট খায়। ও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে আইনজীবির সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব দিতে নিজেকে শক্ত করে। আইনজীবি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলো, ওরা কতজন ছিল?

শিমুনা মাথা নিচু করেই জবাব দিল, সাতজন।
আচ্ছা, তুমি কি করে জানলে সাতজন, তোমারতো তখন জ্ঞান ছিল না।

তরপর মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগল, মহামান্য আদালত,জ্ঞানহীন একজন মানুষের পক্ষে কি করে বলা সম্ভব সাতজন ছিল, নাকি দশজন ছিল। এটা সম্পূর্ণ একটা বানোয়াট বা অযৌক্তিক কথা। তাছাড়া দোকান পাকা রাস্তার ধারে। দোকানের মধ্যে চিৎকার করলে নিশ্চয়ই আশেপাশের লোকজন ছুটে আসত। এর মানে হল ও চিৎকার করতে চায়নি। তাছাড়া সেদিন বিকেল থেকেই আকাশ মেঘলা ছিল। ওই অবস্থায় ও বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে ফার্ম দেখতেই বা গেল কেন? মহামান্য আদালত, এর যোগফল অতি সোজা। আর তা হচ্ছে বাদী একটা নষ্টা মেয়ে। ওদের আগেই কথা হয়েছিল এবং পনেরশত টাকা রফা হয়েছিল আর .... আইনজীবীর কথা শেষ হতে দেয় না শিমুনা। তার আগেই না না ধ্বনিতে আদালত

প্রকম্পিত করে। মহামান্য আদালতের বোধকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। কিন্তু প্রচলিত আইনের কাছে নিজেকে অসহায় মনে হয় তার।

আইনজীবি আবার জিজ্ঞাসা করে, আপনার নিশ্চয়ই আপত্তি ছিলনা।
শিমুনা আর কথা বলতে পারেনা। তার অশ্রুশূন্য চোখে ক্রোধানল জ্বলে উঠে। আদালতকে ওর আর একজন ধর্ষক মনে হয়। ও আর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে পারেনা। মাথাটা ঝিম ঝিম করে শরীরটা অসার হয়ে আসে।

আসামীদের জামিনের মধ্য দিয়ে সেদিনের মত আদালত মুলতবি হয়। মামলা চলতে থাকে অমরত্বের বর পেয়ে। নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে গড়ায়।

যেদিন আদালতে তারিখ থাকে সেদিন শিমুনার বিরক্ত লাগে। মাঝে মাঝে মনে হয় মামলা না করলেই ভাল হত। তাকে বারবার আদালতে উপস্থিত হয়ে অত লোকের সামনে সেই বিভীষিকাময় ঘটনাটা বর্ণনা করতে হতোনা। সেই নরপশুদের সামনা সামনি দাঁড়াতে হত না। হয়তো অনেক লোকেই ঘটনাটা কোনদিন জানতে পারত না। আর এখনতো মুল্লুকসুদ্ধ সবাই জানে। বাড়ি থেকে মোটেও বাইরে বেরোতে ইচ্ছে করে না শিমুনার। পাড়ার দু-চারটা মানুষ কোথাও জটলা হয়ে আলাপ করলে মনে হয়, যেন সে বিষয়েই আলাপ করছে। কেউ কেউ আবার করুণা করতে আসে, সহানুভূতি জানাতে আসে। আর ঠিক তখনি মনের ক্ষতটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। কখনো কখনো মানুষের কটুক্তি কানে আসে, কানে আসে ব্যঙ্গ। সেদিন বিজয়ের বাবা একটা সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিল। পাড়ার কে যেন সেই ঘটনা বলে দেয়ায় বরপক্ষ আর শিমুনাদের বাড়ির আঙ্গিনায় পা দেয়নি। শিমুনার বাবা তাদের বাড়িতে আসার অনুরোধ করলে তারা মুখের উপর বলে দিয়েছিল, একটা নষ্টা মেয়েকে ছেলের বৌ করে নিয়ে যেতে পারব না বাপু। কথাটা শিমুনাকে ভাবিয়ে তোলে। এ সমাজের যত দোষ মেয়েদের। মেয়েরা নষ্টা হয়, ছেলেদের কিছু যায় আসে না। ওদের সাত খুন মাফ, কারণ ওরা ছেলে। বিয়ের আগে মেয়ের চরিত্রটাকে দেখা হয়, কিন্তু ছেলেদের যাচাই করা হয় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই পাপ। মহাপাপ। সে কি মেয়ে হয়ে জন্মেছে, নাকি সমাজ-পরিবার তাকে ক্রমে ক্রমে মেয়েতে রূপান্তরিত করেছে। তাকে ছোট বেলায় বলা হতো এটা করোনা, ওটা করোনা, এটা মেয়েদের মানায় না। এখনো একটা ব্যাপার বুঝে উঠতে পারেনা শিমুনা। মা প্রায়ই বলত, মেয়েদের আগে খেতে নেই, আগে ভাই খাবে তারপর। এই বৈষম্যটা কখনোই মানতে পারতো না সে। তাই প্রায়ই খেয়ে ফেলতো আগে আগে। একদিন মার হাতে ধরা পরে কি মারটা না খেয়েছিল এইজন্য।

শিমুনা হালের অবস্থান থেকে তার নির্মল অতীতের দিকে তাকায়। কোন অন্যায় তার স্মৃতিপটে ধরা পরেনা। তাহলে কেন এমন হল তার? কেন একটি ঘটনা

ভবিষ্যৎটাকে মাটি চাপা দিল তার? যার অপবাদ তাকে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে। সেদিন তো মরে গেলেই ভাল হতো। কি করে বেঁচে গেল সে, আর এখন তো কুয়াশাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ তার, তারপরও কেন বেঁচে আছে সে? এই নিরর্থক জীবনে বেঁচে থাকার অর্থই খুঁজে পায় না শিমুনা। এই অভিশপ্ত জীবন তাকে বয়ে বেড়াতে হবে ভাবতেই কেমন যেন অবাক লাগে। ঘুম আর নির্ঘুমে দিন রাত্রির তফাৎ খুঁজে পায়না সে। কখনো মনে হয়, যেন অনন্ত রাত। আবার কখনো মনে হয় অনন্ত দিন। এক সময় যে বান্ধবীদের সাথে বিকেলে পুকুর পাড়ের কদম তলাটায় বসে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিত এখন তাদের যেন কেমন পর পর মনে হয়। তাদের সাথে কথা বলে আর তেমন আনন্দবোধ হয়না তার। কিংবা ওদের আড্ডায় নিজেকে তার অবাঞ্চিত মনে হয়।

অথচ শিমুনা ছাড়া যেন আড্ডাই জমত না ওদের। আগামী দিন বিটিভিতে কি অনুষ্ঠান আছে ? কোন অভিনেতার সাথে কোন অভিনেত্রীর বিয়ে হওয়ার কথা চলছে ? 'আশা' হলে কোন ছবিটা চলছে ? কিংবা বিবিসির সংবাদ শিরোনামে কোন দেশের ঘটনা এল? তা সবই যেন তার হাতের মুঠোয়। একটার পর একটা ঘটনা জোড়াতালি দিয়ে একাই ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতে পারতো ওদের মাতিয়ে রেখে।

আজ সকাল থেকেই শরীরটা ভার ভার লাগছে শিমুনার। চোখে মুখে পানি দিয়েও যেন তার ফ্রেশ লাগছে না। বারান্দার পাশে পেয়ারা গাছটার তলায় এসে দাঁড়ায় সে। বারান্দার ধারে লাগানো পাতাবাহার গাছগুলো কেমন যেন ঝিমিয়ে গেছে। আজ অনেকদিন গাছগুলোর গোড়ায় পানি দেওয়া হয়না। বড় মায়া লেগে হয় বেচারা গাছগুলোর জন্য। শিমুনা টিউবয়েল থেকে পানি এনে গাছগুলোর গোড়ায় ঢালে। আগাছা পরিষ্কার করে দেয়। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে শিমুনার। বারান্দার খুটিটা ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চায়। পারে না। মাগো বলে আঙ্গিনায় লুটিয়ে পড়ে।

শিমুনার মা রান্না ঘর থেকে ছুটে এসে মেয়েকে তুলতে চায়, কিন্তু মেয়ের জ্ঞানশূন্য নিথর দেহটা দ্বিগুণ ভারী মনে হয় তার কাছে। তারপরও কোনরকমে জাপটে ধরে কোলে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয় শিমুনাকে। রামিজ ডাক্তার নিয়ে আসে। ডাক্তার শিমুনাকে ভাল করে দেখার পর রামিজের দিকে তাকায়। রামিজ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ডাক্তার বলে, রামিজ, আরেকটা অঘটন ঘটে গেছে। শিমুনা মা হতে যাচ্ছে। হঠাৎ কালবৈশাখীর হোঁচট যেন রামিজের বুক ছুঁয়ে শায়লার বুকে গিয়ে লাগে। শায়লা ডুকরে কেঁদে ওঠে। শিমুনা মা হতে যাচ্ছে-কথাটা একই ভাবে শিমুনার বুকেও আঘাত করে। ও কিছু বলার জন্য বিছানায় উঠে বসতে চেয়েও পারেনা। কেবল দু'চোখ দিয় অশ্রু বাঁধভাঙ্গার

মত গড়িয়ে পড়ে। ও শত চেষ্টা করেও আর কিছু বলতে পারে না। বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে।

আপাতত শিমুনাকে সান্তনা দিয়ে রাখার পরামর্শ দিয়ে ডাক্তার চলে যায়। তাদের বোবা কান্নার পর্বটা দীর্ঘায়িত হয় সেদিন। যেদিন মামলাটা অমরত্বের বর পেয়ে নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে গড়ায়। যৌক্তিক অযৌক্তিক অপব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে বাঁধভাঙ্গা সময়ের স্রোতে শিমুনার পেটের ভ্রুণটা সময়ের টানে পাঁচ মাস পূর্ণ করে। ক্রমান্বয়ে মা হতে চলেছে শিমুনা।

সেদিন ডাক্তারের মুখে কথাটা শোনার পর থেকেই বাবা-মা কেমন যেন মুখ ভার করে কথা বলছে। সব কিছুতেই মা তার উপর রেগে যাচ্ছে। অথচ সেই দুর্ঘটনার পর থেকেই মা তার মাথায় প্রায়ই হাত বুলাত আর বলত- চিন্তা করোনা লক্ষী মা আমার। সব ঠিক হয়ে যাবে। সবই ঠিক হয়ে আসছিল কিন্তু ডাক্তারের মুখে "মা" কথাটা শোনার পর থেকেই যেন বাড়ির দৃশ্যপট পাল্টে গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই আঙ্গিনায় মাচার উপর লাউ গাছটা কেমন যেন ঝিমিয়ে গেল। বারান্দার ধার দিয়ে লাগানো পাতাবাহার গাছগুলো আর তেমন সুন্দর লাগছে না। ঘরের চালের সাথে ঝুলানো খাঁচার কবুতরগুলো মাসে মাসে আর বাচ্চা দেয়না তেমন, হালের বলদ দু'টোকেও কেমন যেন হাড্ডিসার মনে হচ্ছে। আর বাবা কেবল হরিণ মার্কা বিড়ি একটা শেষ হতে না হতেই আর একটা জ্বালাচ্ছে- এসব পরিবর্তন অবাক হয়ে ভাবে শিমুনা।

শিমুনা মা হতে চলেছে, আজ সকাল থেকে হঠাৎ করেই কথাটা ভাবতে কেমন যেন মনটা জুড়ে আসছে তার। কেমন যেন পূর্ণতা লাগছে তার। নারী জীবনের সবচেয়ে সার্থকতা হল মা হওয়ার মধ্যে। সেই মা সে হতে চলেছে। কথাটা ভাবে আর পুলকিত বোধ করে শিমুনা। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মন তার ভরে থাকে সারাক্ষণ।

আচ্ছা, সন্তানটি জীবন বৃত্তান্তে কি লিখবে পিতার জায়গায়? নাকি সে নিয়ম ভেঙ্গে পিতার জায়গায় লিখবে 'পিতারা'। কারণ তারতো একাধিক পিতা। নাকি আবার ততদিনে সমাজের নিয়ম বদলে যাবে। মায়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচয় হয়ে দাঁড়াবে? কথাগুলো যত গভীর ভাবে ভাবিয়ে তুলে শিমুনাকে, তত গভীরে ভাবেনা সে, কিংবা ভাবতে চায়না।

শিমুনা নিজের মধ্যে অমরত্বের অস্তিত্ব অনুভব করে। অনন্তকাল বেঁচে থাকার অবলম্বন অনুভব করে সে। সে জানে এটা সমাজ মেনে নেবে না। কোন মতেই মেনে নেবে না। সমাজকে তার অর্থহীন মনে হয়। তার সর্বনাশ রোধ করতে পারেনি যে সমাজ। সে সমাজ শুধু তার সন্তানের অপবাদ দিতে পারবে। পারবে লাঞ্ছনা দিতে। এসব প্রতিকূলতাকে ডিঙ্গিয়ে মাঘের রোদ্দুর গায়ে মেখে ভোরের কুয়াশায়

হেঁটে বেড়াবার স্বপ্ন দেখে শিমুনা। সে স্বপ্ন দেখে, আষাঢ়ের কদম ফুলের মত পহেলা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে স্নাত হবার।

সেদিন রাতের অন্ধকার জনপথে মিশেছে, নক্ষত্রের দুঃসময়, আকাশে মেঘের ঘনঘটা। শিমুনা বিছনায় শুয়ে শুয়ে হ্যারিকেনের কাঁপানো আলোয় চোখে বাইবেলের পাতার অক্ষরগুলো গিলছে। এমন সময় দরজা ঠেলে মা এলো ঘরে। আর যখন মা এলো তখন ও মঙ্গলগ্রহে কুমারী মায়েদের সন্তানদের নিয়ে একটা সভ্যতার কথা ভাবছে। ও ভাবছে, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মঙ্গলপৃষ্ঠ ফুলে ফেঁপে উঠবে মানুষে মানুষে। সেখানে নতুন প্রজন্ম বিকৃত ইতিহাস থেকে মুক্ত থাকবে, মুক্ত থাকবে আমাদের পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক মন্তব্য দূষণ থেকে। ওখানে হবে শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা। এ জগতের সব সংকট মুক্ত হয়ে মঙ্গল পৃষ্ঠ ভরে উঠবে এক বিশুদ্ধ মানব সভ্যতায়। প্ল্যাটো, এ্যারিস্ট্যাটল ও রুশোর স্ব-বিরোধী জগাখিচুরি এলোমেলো রাষ্ট্র চিন্তার বাইরে এক বিশুদ্ধ মানবিক রাষ্ট্র। যেখানে রক্ষিত হবে মানুষের অধিকার। মানবতার অধিকার।

মায়ের পায়ের শব্দে ওর স্বপ্ন ভঙ্গ হল। মায়ের হাতে গ্লাস ভরা দুধ, আর জগে পানি। বাইরে প্রকৃতির ছন্নছাড়া দিক ভুলানো অমানবিক বাতাসের ধ্বংসযজ্ঞ। মায়ের হাতে দুধ দেখে ও পুলকিত হল। কোন বাক্য বিনিময় ছাড়া মায়ের হাত থেকে দুধের গ্লাসটি নিয়ে এক ঢোকে খেল। তারপর মা একটা টেবলেট ওর হাতে দিয়ে বলল- খাও।

শিমুনা অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকায়। তারপর চোখ নিচে নামিয়ে বলে- আমারতো কোন অসুখ করেনি মা, আমি তো ভাল আছি।

শায়লা একটা মলিন হাসি দিয়ে বলে- মাঝে মাঝে অসুখ না করলেও ঔষুধ খেতে হয় মা।

শিমুনা কথা না বাড়িয়ে টেবলেটটা নেয় মার হাত থেকে। বলে, ঠিকআছে মা,একটু পড়ে খাবো। শায়লা চলে গেলে শিমুনা জানালা দিয়ে টেবলেটটা বাইরে ফেলে দেয়। মনে মনে বলে, মাগো, বাবাগো, তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। আমি যে আমার ভেতর মায়ের অস্তিত্ব অনুভব করি প্রতি মুহূর্তে। মা হয়ে আমি কিভাবে আমার সন্তানের মৃত্যু চাইবো। তোমরাই বলো মা। বলো বাবা।   কোন অপরাধ না করেও এতো বড় শাস্তি আমি কেন পাবো। শাস্তি যদি দিতেই হয় তবে তাদের দাও, যারা সমাজে অগ্রহণযোগ্য সন্তানের জন্ম দেয়।

কিছুদিন বাদেই শিমুনা মা হয়। নতুন প্রজন্মের কান্না হাসি সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে শিমুনাকে।

সেই কান্নায় ভর করে সে ভেসে বেড়ায় তার স্বপ্নের মঙ্গল গ্রহে।

মোঃ আকতারুজ্জামান*

হে যুবক সাবধান

গ্রামের আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যাচ্ছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে একটি ছেলে বলে উঠল –

আমি আর স্কুলে আসবোনা। কারণ, পড়াশুনা খুব কষ্ট। পড়া না পারলে স্যার কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখেন।

ছেলেটির কথা শেষ হতেই আরেকটি ছেলে বললো –

পড়া না পারলেত স্যার শাস্তি দিবেই। তাছাড়া স্যারতো আমাদের ভালর জন্যই এমন করে। শুনিস্নি, "লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে"–আর স্যারতো আমাদের গাড়িতেই চড়াতে চায়।

এসব কথা বলতে বলতে তারা স্কুলে পৌঁছাল এবং ক্লাশে গিয়ে বসল। অল্প কিছুক্ষণ পর স্যার ক্লাশে ঢুকল এবং জিজ্ঞাসা করলো –
তোমরা কেমন আছ?

আমরা ভাল আছি স্যার। আপনি কেমন আছেন?

আলহামদুলিল্লাহ্। আমি ভাল আছি। যা হোক – আজকে আমি তোমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। বিষয়টি হচ্ছে,"ধুমপান ও মাদক দ্রব্য" নিয়ে। যা আমাদের দেহ ও স্বাস্থের জন্য খুবই ক্ষতিকর। একটি সিগারেট গ্রহণে একজন মানুষের ৫.৩০ মিনিট আয়ু কমে। এছাড়াও যক্ষা, কাশি, হাঁপানি ও ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ হয়।

তাই তোমরা কখনো ধুমপান করবে না ও মাদক গ্রহণ করবে না। এবং তোমাদের বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে মাদক সম্পর্কে সচেতন করবে যাতে তারা মাদক দ্রব্য গ্রহণ না করে।

* শিক্ষার্থী, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

ক্লাশ শেষে সুমন বাড়িতে গিয়ে দেখে তার বাবা বিড়ি টানছে। সে তার বাবাকে ধুম পানের কুফল সম্পর্কে জানাল এবং ধুমপান ছেড়ে দিতে বলল। কিন্তু তার বাবা শুনল না। যা হোক, এভাবে দিন চলতে লাগল। সুমন শত চেষ্টা করেও তার বাবাকে এই পথ থেকে ফিরাতে পারলো না।

সুমন এস এস সি পাশ করে কলেজে ভর্তি হলো। কলেজে তার অনেক নতুন বন্ধু-বান্ধব জুটল। তাদের মাঝে লাভলী নামের একটি মেয়েকে সুমনের খুব ভাল লাগে। এক সময় তাদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে। সুমনের সময় এখন বেশ আনন্দেই কাটে। এরই মধ্যে সুমনের কিছু নতুন বন্ধু জুটে যায় যারা মাদকাসক্ত। তারা সুমনকে ধুমপানের জন্য উৎসাহ দেয়।

একদিন সুমন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিল। এ সময় সে দেখল রাস্তার পাশে একটি গাছের নীচে বসে তার বন্ধুরা ধুমপান করছে। সুমনকে দেখে তার বন্ধুরা তাকে ডেকে নিয়ে সিগারেট খেতে বলল। বন্ধুদের চাপাচাপির মুখে সুমনের আপত্তি বাতাসে মিলিয়ে যায়। সিগারেট খাওয়ার মধ্যে লাভলীর ফোন আসে। সুমন কোথায় কি করছে জানতে চায় লাভলী। হকচকিয়ে যায় সুমন। সে একবার বলে সিগা খাচ্ছি এবং পরক্ষণেই তারাতারি করে বলে, না না-সেজান জুস খাচ্ছি।

এভাবে সুমন তার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একদিন পুরোপুরি মাদকাশক্ত হয়ে যায়। লাভলী জানতে পেরে সুমনকে বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোন কাজ হয় না। শেষে বাধ্য হয়ে লাভলী সুমনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এ অবস্থায় সুমন আরো অস্থির হয়ে পাগলের মতো ঘুরতে থাকে। নেশার কাছে ভীষণ ভাবে আত্ম সমর্পণ করে সুমন। টাকার প্রয়োজন হয়। টাকার জন্য সুমন শেষ পর্যন্ত ছিনতাই শুরু করে।

একসময় সুমনের চেতন হয়। সে ভাবতে থাকে – "নেশার জন্য লাভলী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমি ছিনতাই শিখেছি। না, আর নেশা নয়। যারা আমাকে এ পথে এনেছে তাদের আমি ছাড়বো না। কখনো ছাড়বো না।"

নিজের মধ্যে পরিবর্তন অনুভব করে সুমন। একদিন রাতের বেলা সে একটি হকিষ্টিক আর কেরোসিন তেল নিয়ে রওনা হয় তার মাদক আস্তানার দিকে। দেখে, তার বন্ধুরা একেকজন নেশায় চুর। কেউ কেউ মাদক বেঁচাকেনাও করছে। সুমনের গরম মাথা আরও গরম হয়ে যায়। হকিষ্টিক দিয়ে সে এলোপাতাড়ি পেটাতে থাকে বন্ধুদের। এক পর্যায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আস্তানায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ আসে। সুমনকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ।

পরদিন এ খবর ফলাও করে ছাপা হয় পত্রিকায়। প্রধানমন্ত্রীর চোখেও পড়ে খবরটি। তিনি ভাবেন-"এসবের জন্যতো আমিই দায়ী। আমি নিজেইতো এই ব্যবসার সাথে জড়িত। আমার জন্যইতো দেশের নিষ্পাপ যুব সমাজ আজ ধব্বংসের মুখে। অর্থের লোভে আমি একি করছি। আমি অন্যায় করছি। আমি অন্যায় করছি।"– বিবেকের কাছে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হন তিনি। অনুশোচনায় ভোগেন। সিদ্ধান্ত নেন, আজই জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন তিনি। সন্ধ্যা সাতটায়।

প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে বলেন, "মাদকের প্রভাবে দেশের নিষ্পাপ যুব সমাজ আজ ধক্ষংসের মুখে। এ পরিস্থিতি রোধ করতে হবে। আমাদের জীবন দিয়ে হলেও। দেশে অবৈধ পথে মাদক দ্রব্য প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। অপরাধী যেই হোক, তাকে শাস্তি পেতে হবে। যৌথ বাহিনীর কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, তারা যেন এ ব্যাপারে আগামী বাহাত্তুর ঘন্টার মধ্যে অত্যন্ত সন্তোষ জনক সমাধান সম্পন্ন করেন। যুবকদের প্রতি আমার অনুরোধ,

'হে যুবক, সাবধান' –একমাত্র তোমরাই পারো একটি সোনার বাংলা গড়ে তুলতে। আল্লাহ্ হাফেজ।

অনুবাদক ঃ কাজী মহাম্মদ আশরাফ*

মূল ঃ মোহাম্মদ মনশা ইয়াদ

আমার পা

(মোহাম্মদ মনশা ইয়াদ। জন্ম ঃ শেখপেরা, পশ্চিম পাঞ্জাব। পেশা ঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। উর্দু ও পাঞ্জাবী সাহিত্যে এমএ। সাহিত্যকর্ম ঃ বন্দ মুট্টিও মে জুগনু, মাংস আওর মিট্টি, খলা অন্দর (উপন্যাস), খলা (গল্প সংকলন) ইত্যাদি। এছাড়াও কবিতা, চিত্রনাট্যও রচনা করেন তিনি। বর্তমান বসবাস ঃ ইসলামাবাদ,পাকিস্তান। 'আমার পা' গল্পটি ইংরেজী থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। "খরঃবৎধঃঁৎব ওফবধং অৎঃং অ ঝধধৎপ ঔড়ঁৎহধষ ঠড়ষ . ২ ; ঘড়. ১ ; অঢ়ৎরষ ২০০৬চ সংখ্যায় "গু ঝড়ড়ঃ ! গধহংযধ ণধফচ এই শিরোনামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন আশফাক নাকভী। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন অজিত কোর।)

পরদিন আমাদের ফিরতে হয়েছে। বিকল্প হিসেবে সে চেয়েছে আমাদের গ্রামটি ঘুরে দেখতে। বুঝতে পারছিনা কোথায় নিয়ে কি দেখাবো। সে আমার রোমান্টিক গল্পগুলো পড়েছে। তার চোখ এখন ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই কল্পিত দৃশ্যপট। ব্যাপারটা আমাকে বেশ লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। এখন সে যা কিছু দেখছে সব অর্ধনগ্ন। রাস্তা অপরিচ্ছন্ন। নোংরা ছেলেরা খেলছে। ব্রিজের নীচে নোংরা পানিতে লাফাচ্ছে। নিজেকে ছোট লাগছে। কণ্ঠ শুকিয়ে আসছে।

আমাদের গ্রামটি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। নোনা পানি ঢুকে সম্পূর্ণ এলাকা নিষ্ফলা করে দিয়েছে। যেসব বাগানে বন্ধুদের সাথে খেলতাম, গাছে দোলনা ঝুলিয়ে ঝুলতাম সেসব কিছুই নেই। এখন সেখানে পথের কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দের সাথে ভাসছে আটার মিলের ক্রুদ্ধ আওয়াজ। নোংরা বিড়াল, মোষের ঢেকুর। যা আগে কিছুই ছিলনা। এখন পুরু হইচই।

শাকিলা উচ্চ সংস্কৃতিমান ও রুচিশীল। সারাজীবন রয়েছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে। আমিই তাকে গ্রাম দেখাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছি। জানতাম না যে তা এমনিভাবে বদলে গেছে সময়ের উল্টো দিকে। আমার মনে হয়না এক সময় এখানে থেকেছি।

---

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

মানুষগুলোও বদলে গেছে। সেসব দিনের সেই পারস্পরিক সহযোগিতা, ভালবাসার কিছুরই অবশিষ্ট নেই। সবাই এখন বাস্তববাদী। টাকাই এদেরকে এমন বানিয়েছে। শাকিলা সম্ভবত আমার অস্বস্তি বুঝতে পারছে। "আমার কাছে লাগছে গ্রামটি খুব সুন্দর"–সে বলল। "এখানকার মানুষ দেখছি বাস্তবতা সম্পর্কে অনেক সচেতন। এই ক্রান্তিকাল একটি নতুন যুগের জন্ম দেবে"–সে আবার বলল।

"নরকের নতুন যুগ"। বিরক্তির সাথে বললাম। "সবার রক্ত যেন ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। তারা সবাই যেন একটা মেলায় এসেছে। সবাই কথা বলে নৈমিত্তিক। এ যেন রোম পুড়ছে আর ওরা বাঁশি বাজাচ্ছে। দেখছোনা সবাই যার যার পথে চলছে? কেউ কারো ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। নগর জীবনের নোংরা দিকগুলোই এখানে ভালভাবে দেখা দিয়েছে।"

"তা হতে পারে"–সে হেসে বলল। "কিন্তু আমি পাচ্ছি এখানে স্বাধীনতা ও বিস্তৃতির অনুভূতি। বিগত কয়েক মাস ধরে নিজেকে ঘৃণা করতে শুরু করেছি। জীবিত রয়েছি কিনা জানিনা। কিন্তু এখানে নতুন একটা দৃশ্যপথ খোলা দেখছি চোখের সামনে। আমি দেখছি পৃথিবী ও স্বর্গের মাঝে এক নতুন সম্পর্ক।"

তার কথাগুলো আমার লজ্জা দূর করতে সাহায্য করছে। তবে তার কথায় বাড়াবাড়ি আছে। আমি এখনও অস্বস্তিতে আছি।

যখন আমরা বাড়িতে ফিরলাম পিরানদিত্তা গলিতে এসে দেখা করলো। সে গ্রামের একমাত্র ভাড়ার গাড়ি চালায়। অর্থাৎ গ্রামে একটাই মাত্র গাড়ি। সেটা তার। আমরা তাকে আগেই আমাদের প্রোগ্রামের কথা জানিয়েছি যে, শনিবার সকালে সে আমাদের তুলে নেবে। বড় রাস্তায় বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দেবে। এখানে তাকে দেখে প্রথমে ভাবলাম, সে আয়োজন নিশ্চিত করতেই এসেছে। কিন্তু সে যা বলল তা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

"আপনারা অন্য কোনও গাড়ির ব্যবস্থ্ করেন"–সে অনুনয় করে বলল।
"কেন, কি হয়েছে? তোমার ঘোড়া অসুস্থ ?"– জিজ্ঞাসা করলাম।
"না স্যার"–সে দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলল। এইমাত্র খবর পেলাম চৌধুরী হক নওয়াজ সাহেবকে কাল সকালে শহরে যেতে হবে।"
"নো প্রোবলেম"–বললাম তাকে। "তিনিও আমাদের সাথে চড়বেন।"
"না না"–সে বলল। "বড়লোকেরা অন্যদের সাথে গাড়ি চড়ে না।"

"তিনি কি অনেক লম্বা?"–শাকিলা বিস্মিত হয়ে বলল। "নাকি তার সামনে আমাদের বামন দেখাবে।"

পিরানদিত্তা ভয়ার্ত চোখে চারদিক দেখল। "তিনি সবসময় গাড়ি ভাড়া করে একা চড়েন।"

"ঠিকআছে, এটাই যদি সমস্যা হয় তাহলে তোমার উচিৎ আমাদের নেওয়া। কারণ, আমরা তোমাকে আগে বলে রেখেছি।" কতৃত্বের সুরে শাকিলা বলল।

শাকিলাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম এটা বড় শহর না। এ গ্রামে অগ্রিম বুকিং কিংবা রিজার্ভ করার মতো কোনও ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া চৌধুরী হক নওয়াজ সাহেব অত্র এলাকার দুই তৃতীয়াংশ জমির মালিক। পিরানদিত্তা কখনোই তার আদেশ অমান্য করতে সাহস পাবে না।

তবুও সে বলে চলেছে। আমাকে বলছে। "তুমি চৌধুরীর কাছে যাও। গিয়ে বলো যে আগামীকাল সকালে আমরা যাবো। এবং আমরা আগেই গাড়ি বুক করে রেখেছি।"

"তিনি খুব উদ্ধত ও বদ মেজাজী"–বললাম তাকে। "তিনি এটাকে অপমান হিসেবে নেবেন।"

"তুমি কি তাকে ভয় পাও ?"–শাকিলা ধারালো দৃষ্টিতে তাকালো। "আমাকে যেতে দাও। আমিই তার সাথে কথা বলবো।"
"এটা ঠিক হবেনা"–বললাম।

"ম্যাডাম"–পিরানদিত্তা বললো। "যার মান ইজ্জত আছে তার সাথে কথা বলতে ভয় পাবেই।"

"কি অদ্ভুত!"! সে বলল। "একজন মানুষকে অন্য মানুষ ভয় পায়। এটা অবিশ্বাস্য!"

"সব মানুষ যথাযথ মানুষ নয়"–পরিষ্কার ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলাম তাকে। "সে হতে পারে একজন ভাল ড্রাকুলা। সময়ে ড্রাগনও মানুষ রূপ ধরে। কিন্তু এটা যাই হোক। প্লিজ, তুমি সিনেমার নায়িকা হতে যেওনা। সব ভুলে যাও। আমরা অন্য ব্যবস্থা করবো।"

"কিন্তু আমি অন্যায় দেখলে বলবোই। এটা প্রচলিত রীতি-নীতির বাইরে"–সে বললো।

"হ্যাঁ ঠিকআছে"–মেনে নিলাম। "আমরা প্রতিদিন কি নীতি ভঙ্গের ঘটনা দেখিনা? কিছু করতে পারি আমরা? ইচ্ছে থাকা সত্বেও পারিনা। প্লিজ, এ সামান্য ব্যাপারে মন খারাপ করোনা।"

"কিন্তু এটা কি আশ্চর্যের নয় যে একজন লোক প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত জমির শুধু মালিক হওয়ার কারণে গাড়িতে অন্যের পাশে বসতে চাইবে না? সে কি জানেনা কোন যুগে বাস করছে?"

"তিনি অত্র এলাকার নিয়ন্ত্রণভার নিয়েছেন। তিনি বাস করেন নিজের সময়ে। আর এটা ভুলে যেওনা যে, আমরা আছি তার রাজ্যে তার সময়ে।"

"বেশ ভালোই জানি"–সে উত্তরে বলল। "আর এটাও জানি এসব লোকের কারণে রুরাল এরিয়ার মানুষ পেছনে পড়ে থাকছে। তারা স্কুল চায় না, রাস্তা-ঘাট চায় না পাছে মানুষ সচেতন হয়ে যায়, তাদের আধিপত্য চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে।"

এতোক্ষণ সে বলেছে আমি ধৈর্য ধরে শুনেছি। আমি জানি সে কয়েকদিন ধরে নিজের শ্রেণীতে অবস্থান করছে না।

পিরানদিত্তা চলে গেলে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। তাকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করলাম। যাতে সারারাত ধরে বাড়িতে বক্তৃতা দিতে না থাকে।
যেই আমরা বসছি পিরানদিত্তা ফিরে এলো।
"এখন কি হলো?" জিজ্ঞাসা করলাম তাকে।
"স্যার, অনুমতি পেয়েছি।"
"কিভাবে?"

"চৌধুরী সাহেবকে বললাম যে রাস্তা ভেঙ্গে-চুরে গেছে। আর ধুলার ঢেউ উঠছে। তার জামা-কাপড় নষ্ট হয়ে যেতে পারে।"
"তারপর?"
"তিনি কালুকে ডেকে ঘোড়া জুততে বললেন।"
"কোন ঘোড়া?"–শাকিলা জিজ্ঞাসা করলো।
"কেন তার নিজের ঘোড়া"–উত্তর দিলো পিরানদিত্তা। "তাদের পারিবারিক ঘোড়া একটা।"

পিরানদিত্তাকে ধন্যবাদ দিয়ে পরদিন সকালে যথাসময়ে আসতে বলে দিলাম। সে চলে গেল। কিন্তু শাকিলা এখনও উত্তেজিত। "তিনি ভাড়া গাড়িতে অন্যের সাথে শেয়ার করে উঠেন না।"–সে ঘৃণার সাথে বলল। "এটা নোংরা জমিদারী মনোভাব, ফু ঃ।"

"এখন রাগ কমাও"–হেঁসে বললাম তাকে। "সমস্যা হলো যে কখনো চৌধুরী সাহেব তোমাকে দেখেননি।"

সে অবাক চোখে আমার দিকে তাকলো। তার দিকে ফিস্ ফিস্ করে বললাম,"যদি তিনি তোমাকে দেখতেন, তিনি মনে করতেন তোমার পাশে বসা তার সৌভাগ্য।"

তার রাগ কমে যেতে লাগলো। ঠোঁটের কোনে হাঁসি দেখা গেল। তার মুখের কথা সরে গেছে। "আমার পা"–শুধু এটুকুই বলতে পারলো।

পরদিন সকালে যখন ভাড়া গাড়িটিতে চড়ে আমরা কিছুদূর গেলাম দেখতে পেলাম আমাদের সামনে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন চৌধুরী হক নওয়াজ সাহেব। তার মাথায় মাড় দেওয়া রঙিন পাগড়ি। পেছনে তার চাকর কালু হেঁটে যাচ্ছে। তার শরীর ঘোড়ার খুরের ধুলোয় মাখামাখি অবস্থা। রাস্তার অন্যপাশের জমিতে কাজ করছিল যারা, চৌধুরী সাহেবকে চিনতে পেরে কাজ থামিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম জানাচ্ছে।

সকাল থেকেই রোদের তাপমাত্রা বাড়ছে। কড়া গরম পড়ার আগেই আমরা বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছে যেতে চাইছি। কিন্তু পিরানদিত্তা তার টাট্টুঘোড়াকে টেনে রাখছে। চৌধুরী সাহেবকে ওভারটেক করার সাহস পাচ্ছে না।

কালুর জন্য দুঃখ হচ্ছে। সে ধুলায় সাদা হয়ে গেছে প্রভুর পিছু হাঁটতে হাঁটতে। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা কেউ এ ব্যাপারে নাক গলাতে পারি না। তবে শাকিলার পীড়াপীড়িতে পিরানদিত্তা কালুকে বলল আমাদের গাড়ির জন্য জায়গা করে দিতে। চৌধুরী সাহেব এ কথা শুনে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন। এক নজর গাড়িটি দেখে কালুকে অনুমতি দিলেন আমাদের এগিয়ে যাবার সুযোগ দিতে।

সর্বশেষ সেতুটি পার হওয়ার সময় দেখি চৌধুরী সাহেব ঘোড়া থামিয়ে একজনের সাথে কথা বলছেন। আমাদের এগিয়ে যাবার পর্যাপ্ত জায়গা ছিল না। তবুও কোন রকমে পার হয়ে যাবার সময় আমরা সালাম বিনিময় করলাম।

"দেখতে তো বেশ সুশোভিত আর মর্যাদাবান বলেই মনে হলো"– বললো শাকিলা। কালুর উপস্থিতির ব্যাপারে ইঙ্গিতে তাকে সচেতন করে দিলাম। এরপরে সে আর কথা বলেনি। যা ভেবেছি তাই,এখনও সে ভাবছে সে বুঝি এখানে তার শ্রেণীতেই আছে।

বাসস্ট্যান্ডে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ভিড়। বাস চলাচল করছে প্রচুর কিন্তু থামছেনা। আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সবাই যার যার গন্তব্যে দ্রূত যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠছে। এরমধ্যে চৌধুরী সাহেবও বাসস্ট্যান্ডে এসে পৌঁছেছেন। লাগামটি কালুর হাতে দিয়ে তিনি অপেক্ষমান যাত্রীদের মধ্যে মিশে গেলেন। অনেকক্ষণ পরে একটা বাস এলো। সবাই দৌঁড়াদৌঁড়ি শুরু করলো। কিন্তু বাসের কন্ডাকটর দরজা

বন্ধ করে রেখেছে। যাত্রীদের দু'হাতে ঠেলে রাখছে। শুধু যারা দূরে যাবে তাদের উঠতে দিচ্ছে। ভাগ্য ভাল আমরা চান্স পেলাম। চৌধুরী সাহেবসহ অন্যেরা পাচ্ছেন না। চাপ দিচ্ছে সবাই,পাল্টা ধাক্কাও খাচ্ছে। চৌধুরী সাহেবের পাগরী মাটিতে পড়ে গেল। দ্রুত তুলে নিয়ে আবার বাসের দিকে দৌঁড়ে এলেন।

দূরের যাত্রীরা যখন নিশ্চিন্তে বসতে পেরেছে তখন কন্ডাকটর অন্যদের ডেকে ডেকে ভেতরে দাঁড় করালো। বাস চলতে শুরু করলো। ঘুরে চেয়ে দেখি চৌধুরী সাহেব দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। পাগড়ি হাতে দাঁড়িয়ে তিনি। ঠেলে ঠেলে পেছনের দিকে চলে গেলেন। শাকিলার দিকে তাকালাম। মুচকি হাসছে। তার হাসি হাজার কথার চেয়েও বেশী অর্থবহ।